BDeBooks.com

E-BOOK

www.BDeBooks.com
FB.com/BDeBooksCom
BDeBooks.Com@gmail.com

গুপী গাইন ও বাঘা বাইন

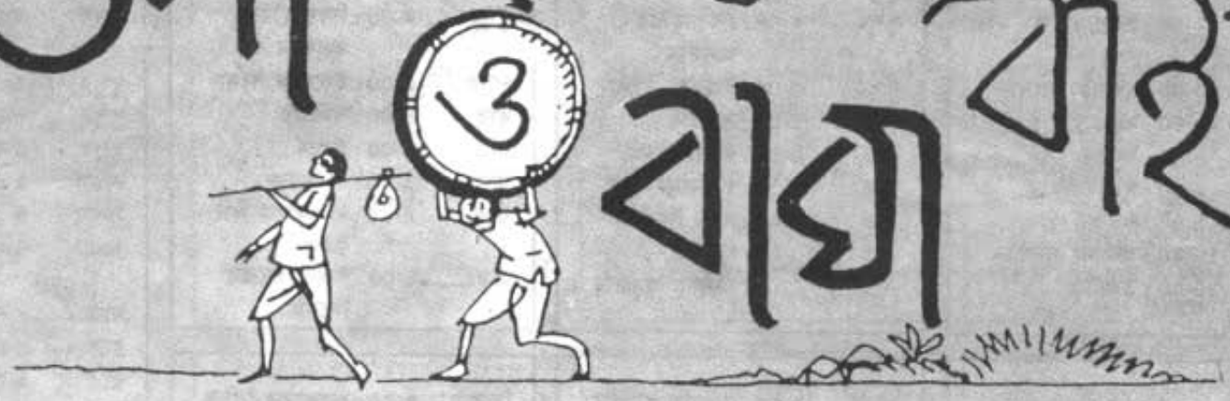

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর কাহিনী 'গুপী গাইন' প্রথম প্রকাশিত হয় সন্দেশ পত্রিকার ২য় বর্ষ ১২ সংখ্যা, চৈত্র ১৩২১ [মার্চ ১৯১৫] থেকে ৩ বর্ষ ৫ সংখ্যা, ভাদ্র ১৩২২ [আগস্ট ১৯১৫] পর্যন্ত। মোট ছয় কিস্তিতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। পরে সত্যজিৎ রায় সম্পাদিত 'সন্দেশ' পত্রিকার প্রথম বর্ষ ষষ্ঠ সংখ্যায়, আশ্বিন ১৩৬৮ [অক্টোবর, ১৯৬১] পুনর্মুদ্রিত হয়। যদিও তখন গল্পের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয়েছিল 'গুপী গাইন ও বাঘা বাইন'।

তোমরা গান গাইতে পার? আমি একজন লোকের কথা বলব, সে একটা গান গাইতে পারত। তার নাম ছিল গুপী কাইন, তার বাবার নাম ছিল কানু কাইন, তার একটা মুদীর দোকান ছিল। গুপী কিনা একটা গান গাইতে পারত, আর সে গ্রামের আর কেউ কিছু গাইতে পারত না, তাই তারা তাকে খাতির করে বলত গুপী 'গাইন'।

গুপী যদিও এ কটা বই গান জানত না, কিন্তু সেই একটা গান সে খুব করেই গাইত; সেটা না গেয়ে সে তিলেকও থাকতে পারত না, তার দম আটকে আসত। যখন সে ঘরে বসে গাইত, তখন তার বাবার দোকানের খদ্দের সব ছুটে পালাত। যখন সে মাঠে গিয়ে গাইত, তখন মাঠের যত গরু, সব দড়ি ছিঁড়ে ভাগত। শেষে আর তার ভয়ে তার বাবার দোকানে খদ্দেরই আসে না, রাখালেরাও মাঠে গরু নিয়ে যেতে পারে না। তখন একদিন কানু কাইন তাকে এই বড় বাঁস নিয়ে তাড়া করতে সে ছুটে মাঠে চলে গেল; সেখানে রাখালের দল লাঠি নিয়ে আসতে বনের ভিতরে গিয়ে খুব করে গলা ভাঁজতে লাগল।

গুপীদের গ্রামের কাছেই আরেকটা গ্রামে একজন লোক থাকত, তার নাম ছিল পাঁচু পাইন। পাঁচুর ছেলেটির বড্ড ঢোলক বাজাবার সখ ছিল। বাজাতে বাজাতে সে বিষম দুলতে থাকত, আর মাথা নাড়ত আর চোখ পাকাত; আর দাঁত খিঁচাত, আর ভ্রুকুটি করত। তার গ্রামের লোকেরা তা দেখে হাঁ করে থাকত, আর বলত, "আহা! আ-া-া!! অ-অ-অ-হ্-হ্-হ্!!!" শেষে যখন সে 'হাঃ, হাঃ হা-া-হ্!' বলে বাঘের মত খেঁকিয়ে উঠত, তখন সকলে পালাবার ফাঁক না পেয়ে চিৎপাত হয়ে পড়ে যেত। তাই থেকে সকলে তাকে বলত 'বাঘা পাইন'। তার এই 'বাঘা' নামই রটে গিয়েছিল; আসল নাম যে তার কি, তা কেউ জানত না। বাঘা ঢোলক বাজাত আর রোজ একটা করে ঢোলক ভাঙত। শেষে আর পাঁচু তার ঢোলকের পয়সা দিয়ে উঠতে পারে না। কিন্তু বাঘার বাজনা বন্ধ হবে, তাও কি হয়? গ্রামের লোকেরা পাঁচুকে বল্ল, "তুমি না পার না হয় আমরাই সকলে চাঁদা করে ঢোলকের পয়সাটা দি। আমাদের গ্রামে এমন একটা ওস্তাদ হয়েছে, তার বাজনাটা বন্ধ হয়ে যাবে?" শেষে ঠিক হল যে গ্রামের সকলে চাঁদা করে বাঘাকে একটা ঢোলক কিনে দিবে, আর সেই ঢোলকটি আর তার ছাউনী খুব মজবুত হবে, যাতে বাঘার হাতেও সেটা আর সহজে না ছিঁড়ে।

সে যা ঢোলক হল! তার মুখ হল সাড়ে তিন হাত চওড়া, আর ছাউনী মোষের চামড়ার। বাঘা সেটা পেয়ে যারপরনাই খুসী হয়ে বল্ল, 'আমি দাঁড়িয়ে বাজাব!'

তখন থেকে সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই ঢোলক লাঠি দিয়ে বাজায়। দেড় মাস দিন রাত বাজিয়েও বাঘা সেটাকে ছিঁড়তে পারল না। ততদিনে তার বাজনা শুনে শুনে তার বাপ মা পাগল হয়ে গেল, গ্রামের লোকের মাথা ঘুরতে লাগল। আর দিন কতক এইভাবে চললে কি হত বলা যায় না, এর মধ্যে একদিন গ্রামের সকলে মিলে মোটা মোটা লাঠি নিয়ে এসে বাঘাকে বল্ল, "লক্ষ্মী, দাদা! তোমাকে দশ হাঁড়ি মিঠাই দিচ্ছি, অন্য কোথাও চলে যাও, নইলে আমরা সবাই পাগল হয়ে যাব!"

বাঘা আর কি করে? তখন কাজেই তাকে অন্য একটা গ্রামে যেতে হল। সেখানে দু দিন না থাকতে থাকতেই সেখানকার সকলে মিলে তাকে গ্রাম থেকে বার করে দিল। তারপর থেকে সে যেখানেই যায়, সেখান থেকেই তাকে তাড়িয়ে দেয়। তখন সে করল কি, সারাদিন মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়ায়, ক্ষুধার সময় তার নিজের গ্রামে গিয়ে ঢোলক বাজাতে থাকে, আর গ্রামের লোক তাড়াতাড়ি তাকে কিছু খাবার দিয়ে বিদায় করে বলে 'বাঁচলাম!' তারপর এমন হল যে আর কেউ তাকে খেতে দেয় না, আর তার ঢোলকের আওয়াজ শুনলেই আশপাশের সকল গ্রামের লোক লাঠি নিয়ে আসে। তখন বেচারা ভাবল, "আর না! মূর্খদের কাছে থাকার চেয়ে বনে চলে যাওয়াই ভাল। না হয় বাঘে খাবে, তবুও আমার বাজনা চলবে!" এই বলে বাঘা তার ঢোলকটি ঘাড়ে করে বনে চলে গেল।

এখন বাঘার বেশ মজাই হয়েছে। এখন আর কেউ তার বাজনা শুনে লাঠি নিয়ে আসে না। বাঘে খাবে দূরে থাক, সে বনে বাঘ ভালুক কিছু নাই। আছে খালি একটা ভারী ভয়ানক জানোয়ার; বাঘা আজও তাকে দেখতে পায়নি, শুধু দূর থেকে তার ডাক শুনে ভয়ে থর থরিয়ে কাঁপে, আর ভাবে, 'বাবা গো! ওটা এলেই ত আমার ঢোলক শুদ্ধ আমাকে গিলে খাবে!'

সে ভয়ানক জানোয়ার কিন্তু আর কেউ নয়, সে গুপী গাইন। বাঘা যে ডাক শুনে কাঁপে, সে গুপীরই গলা ভাঁজা। গুপীও বাঘার বাজনা শুনতে পায়, আর বাঘারই মত ভয়ে কাঁপে। শেষে সে একদিন ভাবল, "এ বনে থাকলে কখন প্রাণটা যাবে, তার চেয়ে এই বেলা এখান থেকে পালাই।" এই বলে গুপী চুপিচুপি বন থেকে বেরিয়ে পড়ল। বেরিয়েই দেখে আর-একটি লোকও এক বিশাল ঢোল মাথায় করে সেই বনের ভিতর থেকে আসছে। তাকে দেখেই ভারী আশ্চর্য্য হয়ে গুপী জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কে হে?"

বাঘা বল্ল, "আমি বাঘা বাইন, তুমি কে?"

গুপী বল্ল, "আমি গুপী গাইন। তুমি কোথায় যাচ্ছ?"

বাঘা বল্ল, "যেখানে জায়গা যোটে, সেইখানেই যাচ্ছি। গ্রামের লোকগুলো গাধা, গান বাজনা বোঝে না, তাই ঢোলকটি নিয়ে বনে চলে এসেছিলাম। তা ভাই এখানে যে ভয়ংকর জানোয়ারের ডাক শুনেছি, তার সামনে পড়লে আর প্রাণটি থাকবে না, তাই পালিয়ে যাচ্ছি।"

গুপী বল্ল, "তাই ত! আমিও যে একটা জানোয়ারের ডাক শুনেই পালিয়ে যাচ্ছিলাম। বল ত তুমি জানোয়ারটাকে কোথায় বসে ডাকতে শুনেছিলে?"

বাঘা বল্ল, "বনের পূর্ব্বধারে, বটগাছের তলায়।"

গুপী বল্ল, "আরে, সে যে আমারই গান শুনেছ! সে কেন জানোয়ারের ডাক হবে? সেই জানোয়ারটা ডাকে বনের পশ্চিম ধারে, হর্ত্তুকী তলায় বসে।"

বাঘা বল্ল, "সে ত আমার ঢোলকের আওয়াজ; আমি যে ঐখানে থাকতাম!"

এতক্ষণে তারা বুঝতে পারল যে, তারা তাদের নিজেদের গান আর বাজনা শুনেই ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল। তখন যে দুজনার হাসি! অনেক হেসে তারপর গুপী বল্ল, "ভাই, আমি যেমন গাইন, তুমি তেমনি বাইন! আমরা দুজন জুটলে নিশ্চয় একটা কিছু করতে পারি।"

একথায় বাঘারও খুবই মত হল। কাজেই তারা খানিক কথাবার্ত্তার পর ঠিক করল যে তারা দুজনায় মিলে রাজা মশাইকে গান শোনাতে যাবে। রাজা মশাই যে তাতে খুব খুসী হবেন, তাতে ত আর ভুলই নাই, চাই কি অর্দ্ধেক রাজ্য বা মেয়ের সংগে বিয়েও দিয়ে ফেলতে পারেন।

গুপীর আর বাঘার মনে এখন খুবই আনন্দ, তারা রাজাকে গান শোনাতে যাবে। দুজনে হাসতে হাসতে আর নাচতে নাচতে এক প্রকান্ড নদীর ধারে এসে উপস্থিত হল; সেই নদী পার হয়ে রাজবাড়ী যেতে হয়। নদীতে খেয়া আছে, কিন্তু নেয়ে পয়সা চায়! বেচারারা বন থেকে এসেছে, পয়সা কোথায় পাবে? তারা বল্ল, "ভাই, আমাদের কাছে তো পয়সা টয়সা নাই, আমরা না হয় তোমাদের গেয়ে বাজিয়ে শোনাব; আমাদের পার করে দাও।" তাতে খেয়ার চড়নদারেরা খুব খুসী হয়ে নেয়েকে বল্ল, "আমরা চাঁদা করে এদের পয়সা দিব, তুমি এদের তুলে নাও।"

বাঘার ঢোলকটি দেখেই নেয়েরও তার বাজনা শুনতে ভারী সাধ হয়েছিল, কাজেই সে একথায় আর কোন আপত্তি করল না। গুপীকে আর বাঘাকে তুলে নিয়ে নৌকা ছেড়ে দেওয়া হল। নৌকা ভরা লোক, বসে বাজাবার জায়গা কোথায় হবে? অনেক কষ্টে সকলের মাঝখানে খানিকটা জায়গা হতে হতে নৌকাও নদীর মাঝখানে এসে পড়ল। তারপর খানিক একটু গুণগুনিয়ে গুপী গান ধরল, বাঘা তার ঢোলকে লাঠি লাগাল, আর অমনি নৌকা শুদ্ধ সকল লোক বিষম চমকে গিয়ে গড়াগড়ি আর জড়াজড়ি করে দিল নৌকা খানাকে উল্টে।

তখন তো আর বিপদের অন্তই নাই। ভাগ্যিস বাঘার ঢোলটি এত বড় ছিল, তাই আঁকড়ে ধরে দুজনার প্রাণ রক্ষা হল। কিন্তু তাদের আর রাজবাড়ী যাওয়া ঘটল না। তারা সারাদিন সেই নদীর স্রোতে ভেসে

ভেসে শেষে সন্ধ্যা বেলায় এক ভীষণ বনের ভিতরে গিয়ে কূলে ঠেকল। সে বনে দিনের বেলায় গেলেই ভয়ে প্রাণ উড়ে যায়, রাত্রির ত আর কথাই নাই। তখন বাঘা বল্ল, "গুপী দা' বড়ই ত বিষম দেখছি! এখন কি করি বল ত।" গুপী বল্ল, "করব আর কী? আমি গাইব, তুমি বাজাবে! নিতান্তই যখন বাঘে খাবে, তখন আমাদের বিদ্যেটা তাকে না দেখিয়ে ছাড়ি কেন?"

বাঘা বল্ল, "ঠিক বলেছ দাদা! মরতে হয় ত ওস্তাদলোকের মতন মরি; পাড়াগেঁয়ে ভূতের মত মরতে রাজী নই!"

এই বলে দুজনায় সেই ভিজা কাপড়েই প্রাণ খুলে গান বাজনা সুরু করল। বাঘার ঢোলটি সেদিন কিনা ভিজে ছিল, তাইতে তার আওয়াজটি হয়েছিল যারপরনাই গম্ভীর। আর গুপীও ভাবছিল, এই তার শেষ গান, কাজেই তার গলার আওয়াজটিও খুবই গম্ভীর হয়েছিল। সে গান যে কি জমাট হয়েছিল, সে আর কি বলব? এক ঘণ্টা দু ঘণ্টা করে দুপুর রাত হয়ে গেল, তবু তাদের সে গান থামছেই না।

এমন সময় তাদের দুজনারই মনে হল যেন, চার দিকে একটা কি কান্ড হচ্ছে। ঝাপসা ঝাপসা কালো কালো, এই বড় বড় কি যেন সব গাছের উপর থেকে উঁকি মারতে লেগেছে; তাদের চোখগুলো জ্বলছে, যেন আগুনের ভাঁটা, দাঁতগুলো বেরুচ্ছে যেন মূলোর সার! তা দেখে তখনই আপনা হতে বাঘার বাজনা থেমে গেল; তার সঙ্গে সঙ্গে দুজনার হাতপা গুটিয়ে, পিঠ বেঁকে, ঘাড় বসে, চোখ বেরিয়ে মুখ হাঁ করে এল। তাদের গায়ে এমনি কাঁপুনি আর দাঁতে এমনি ঠক্‌ঠকি ধরে গেল যে আর তাদের ছুটে পালাবারও যো রইল না।

ভূতগুলি কিন্তু তাদের কিছু করল না। তারা তাদের গান বাজনা শুনে ভারী খুসী হয়ে এসেছে, তাদের রাজার ছেলের বিয়েতে গুপীর আর বাঘার বায়না করতে। গান থামতে দেখে তারা নাকি সুরে বল্ল, "থাম্‌লি কেন বাপ? বাজা, বাজা, বাজা!"

একথায় গুপীর আর বাঘার একটু সাহস হল; তারা ভাবল, "এ ত মন্দ মজা নয়, তবে একটু গেয়েই দেখি না।" এই বলে যেই তারা আবার গান ধরেছে, অমনি ভূতেরা একজন দুজন করে গাছ থেকে নেমে এসে তাদের ঘিরে নাচতে লাগল।

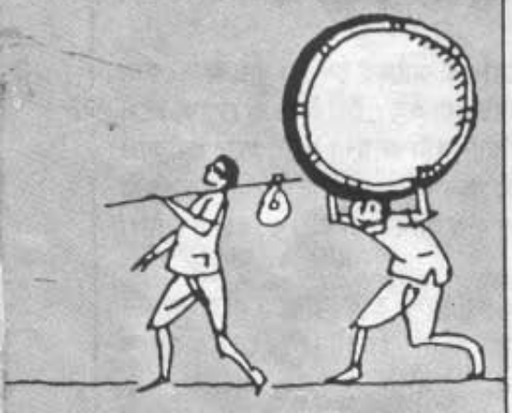

সে যে কি কারখানা হয়েছিল, সে কি না দেখলে বোঝবার যো আছে ? গুপী আর বাঘা তাদের জীবনে আর কখনো এমন সমজদারের দেখা পায় নি। সে রাত এমনি ভাবেই কেটে গেল। ভোর হলে ত আর ভূতেদের বাইরে থাকবার যো নাই, কাজেই তার একটু আগেই তারা বল্ল, "চল্ বাবা, মোদের গোদার বেটার বে'তে! তোদের খুসী করে দিব।"

গুপী বল্ল, "আমরা যে রাজবাড়ী যাব!" ভূতেরা বল্ল, "সে যাবি এখন, আগে মোদের বাড়ী একটু গান বাজনা শুনিয়ে যা! তোদের খুসী করে দিব।" কাজেই তখন তারা দুজনে ঢোল নিয়ে ভূতেদের বাড়ি চল্ল। সেখানে গান বাজনা যা হল, সে আর বলে কাজ নাই। তারপর তাদের বিদায় করবার সময় ভূতেরা বল্ল, "তোরা কি চাস ?"

গুপী বল্ল, "আমরা এই চাই যে আমরা যেন গেয়ে বাজিয়ে সকলকে খুসী করতে পারি!" ভূতেরা বল্ল, "তাই হবে; তোদের গান বাজনা শুনলে আর সে গান শেষ হওয়ার আগে কেউ সেখান থেকে উঠে যেতে পারবে না। আর কি চাস ?"

গুপী বল্ল, "আর এই চাই যে, আমাদের যেন খাওয়া পরার কষ্ট না হয়।" এ কথায় ভূতেরা তাদের একটি থলে দিয়ে বল্ল, "তোরা যখন যা খেতে বা পরতে চাস, এই থলের ভিতরে হাত দিলেই তা পাবি। আর কী চাস ?"

গুপী বল্ল, "আর কি চাইব, তা ত বুঝতে পারছি না!" তখন ভূতেরা হাসতে হাসতে তাদের দুজনকে দু জোড়া জুতা এনে দিয়ে বল্ল, "এই জুতা পায়ে দিয়ে তোরা যেখানে যেতে চাইবি, অমনি সেখানে গিয়ে হাজির হবি।"

তখন ত আর কোন ভাবনাই রইল না। গুপী আর বাঘা ভূতেদের কাছে বিদায় হয়ে, সেই জুতা পায়ে দিয়েই বল্ল, "তবে আমরা এখন রাজ বাড়ী যাব!" অমনি সেই ভীষণ বন কোথায় যেন মিলিয়ে গেল; গুপী আর বাঘা দেখল, তারা দুজন, একটা প্রকাণ্ড বাড়ীর ফটকের স্যমনে দাঁড়িয়ে আছে। এত বড় আর এমন সুন্দর বাড়ী তারা তাদের জীবনে কখনো দেখেনি। তারা তখনই বুঝতে পারল যে, এ রাজবাড়ী।

কিন্তু এর মধ্যে ভারী একটা মুস্কিল হল। রাজ বাড়ীর ফটকে যমদূতের মত কতগুলো দারোয়ান দাঁড়িয়ে ছিল, তারা গুপী আর বাঘাকে সেই ঢোল নিয়ে আসতে দেখেই দাঁত খিঁচিয়ে বল্ল, "এইয়ো! কাঁহা যাতা হ্যায় ?" গুপী থতমত খেয়ে বল্ল, "বাবা, আমরা রাজা মশাইকে গান শোনাতে এসেছি।" তাতে দরোয়ানগুলো আরো বিষম চটে গিয়ে লাঠি দেখিয়ে বল্ল, "ভাগো হিঁয়াসে!" গুপীও তখন নাক সিঁটকিয়ে বল্ল, "ঈস্! আমরা ত রাজার কাছে যাবই!" বল্তেই অমনি সেই জুতার গুণে, তারা তৎক্ষণাৎ গিয়ে রাজা মশাইয়ের সামনে উপস্থিত হল।

রাজবাড়ীর অন্দর মহলে রাজা মশায় ঘুমিয়ে আছেন, রাণী তাঁর মাথার কাছে বসে তাঁকে হাওয়া করছেন, এমন সময় কথা নাই বার্ত্তা নাই – গুপী আর বাঘা সেই সর্ব্বনেশে ঢোল নিয়ে হঠাৎ গিয়ে সেখানে উপস্থিত হল। জুতার এমনি গুণ, দরজা জানালা সব বন্ধ রয়েছে তাতে তাদের একটুও আটকায় নি। কিন্তু আসবার বেলা আটকাক আর নাই আটকাক; আসবার পরে খুবই আটকাল। রাণী তাদের দেখে বিষম ভয় পেয়ে, এক চীৎকার দিয়ে তখনই অজ্ঞান হয়ে গেলেন; রাজা মশায় লাফিয়ে উঠে পাগলের মত ছুটাছুটি করতে লাগলেন; রাজবাড়ীময় হুলস্থূল পড়ে গেল; সিপুই সান্ত্রী সব খাঁড়া ঢাল নিয়ে ছুটে এল।

বেগতিক দেখে গুপী আর বাঘার মাথায় গোল লেগে গেল। তারা যদি তখন শুধু বলে 'আমরা এখান থেকে অমুক জায়গায় চলে যাব', তবেই তাদের জুতার গুণে সকল লাঠা চুকে যায়। কিন্তু সে কথা তাদের মনেই হল না। তারা গেল ছুটে পালাতে, আর দু পা যেতে না যেতেই বেচারারা মারটা যে খেল! জুতা, লাঠি, চাবুক, কীল, চড়, কানমলা, কিছুই তাদের বাকি রইল না। শেষে রাজা মশাই হুকুম দিলেন, "বেটাদের নিয়ে তিন দিন হাজতে ফেলে রাখ। তারপর বিচার করে, হয় এদের মাথা কাটব, না হয় শূলে দিব, না হয় কুত্তা দিয়ে খাওয়াব।"

হায় গুপী! হায় বাঘা! বেচারারা এসেছিল রাজাকে গান শুনিয়ে কতই বকসিস পাবে ভেবে, তার মধ্যে এ কি বিপদ ? পিয়াদারা তাদের হাত বেঁধে মারতে মারতে একটা অন্ধকার ঘরে নিয়ে ফেলে রাখল। সেখানে পড়ে বেচারারা এক দিন আর গায়ের ব্যথায় নড়তে চড়তে পারল না। তাতে তেমন দুঃখ ছিল না, কিন্তু বাঘার ঢোলটি যে গেল, সেই হল সর্ব্বনাশের কথা! বাঘা বুক মাথা চাপড়িয়ে ভেউ ভেউ করে কাঁদছে, আর বলছে, "ও গুপী দা! – ওঃ-ওঃ-হ-হ-হ-হ-অ-অ! আরে ও গুপী দা! মার খেলাম, প্রাণ যাবে, তাতে দুঃখু নেই – কিন্তু দাদা, আমার ঢোলকটি যে গেল!"

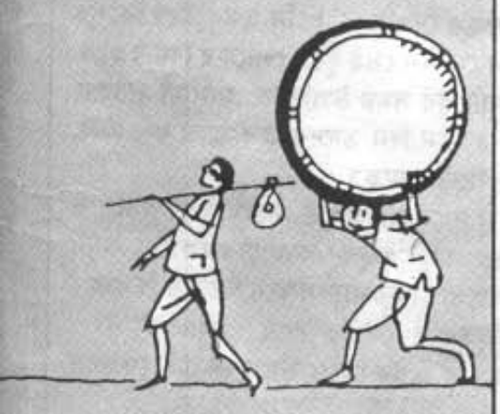

গুপীর কিন্তু ততক্ষণে মাথা ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে। সে বাঘার গায় মাথায় হাত বুলিয়ে বল্ল, "ভয় কি দাদা ? ঢোল গিয়েছে – জুতা আর থলে ত আছে! আমরা নিতান্ত বেকুব, তাই এতগুলো মার খেলাম। যা হোক, যা হবার হয়ে গিয়েছে, এখন এর ভিতর থেকে একটু মজা করে নিতে হবে।" বাঘা এ কথায় একটু শান্ত হয়ে বল্ল, "কি মজা করবে দাদা ?" গুপী বল্ল, "আগে ত খাবার মজাটা করে নিই, তারপর অন্য মজার কথা ভেবে দেখ্ব এখন।"

এই বলে সে সেই ভূতের দেওয়া থলির ভিতরে হাত দিয়ে বল্ল, "দাও তো দেখি, এক হাঁড়ি পোলাও!" অমনি একটা সুগন্ধ যে বেরুল! তেমন পোলাও রাজারাও সচরাচর খেতে পান না। আর সে কি বিশাল হাঁড়ি! গুপী কি সেটা থলির ভিতর থেকে তুলে আনতে পারে ? যা হোক কোন মতে সেটাকে বার করে এনে, তারপর থলিকে বল্ল, "ভাজা, ব্যঞ্জন, চাটনি, মিঠাই, দই, রাবড়ি, সরবৎ! – শিগগির শিগগির

দাও !" দেখতে দেখতে খাবার জিনিসে আর সোনা রূপার বাসনে ঘর ভরে গেল। দুজন লোকে আর কত খাবে? সে অপূর্ব্ব খাবার খেয়ে তাদের গায়ের ব্যথা কোথায় চলে গেল তার ঠিক নাই।
তখন বাঘা বল্ল, "দাদা, চল এই বেলা এখান থেকে পালাই নইলে শেষে কুত্তা দিয়ে খাওয়াবে।" গুপী বল্ল, "পাগল হয়েছ নাকি? আমাদের এমন জুতা থাকতেও কুত্তা দিয়ে খাওয়াবে? দেখাই যাক না, কি হয়।" এ কথায় বাঘা খুব খুসী হল; সে বুঝতে পারল যে গুপীদা একটা কিছু মজা করবে।
দু দিন চলে গেল, আর একদিন পরেই রাজা তাদের বিচার করবেন। বিচারের দিন রাত থাকতে উঠে গুপী থলের ভিতর হাত দিয়ে বল্ল, "আমাদের দুজনের রাজ পোষাক চাই।" বলতেই তার ভিতর থেকে এমন সুন্দর পোষাক বেরুল যে তেমন পোষাক কেউ তয়েরই করতে পারে না। সেই পোষাক তারা দুজনে পরে, তাদের পুরাণো কাপড় আর বাসন কখানি পুঁটুলী বেঁধে নিয়ে, জুতা পায় দিয়ে তারা বল্ল, "এখন আমরা মাঠে হাওয়া খেতে যাব।" অমনি দেখে, রাজবাড়ীর বাইরের প্রকান্ড মাঠে চলে এসেছে। সে মাঠের এক জায়গায় তাদের পুঁটুলীটি লুকিয়ে রেখে, তারা বেড়াতে বেড়াতে এসে রাজবাড়ীর সামনে উপস্থিত হল।
দূর থেকে তাদের আসতে দেখেই রাজার লোক ছুটে গিয়ে তাঁকে খবর দিয়েছিল যে, "মহারাজ, দুজন রাজা আসছেন," রাজাও তা শুনে তাঁর ফটকের সামনে এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন। বাঘা আর গুপী আসতেই তিনি তাদের যারপরনাই আদর দেখিয়ে বাড়ীর ভিতরে নিয়ে গেলেন। চমৎকার একটি ঘরে তাদের বাসা দেওয়া হল। কত চাকর, বামুন, পিয়াদা, পাইক তাদের সেবাতে লেগে গেল, তার অন্ত নাই।
তারপর গুপী আর বাঘা হাত পা ধুয়ে জলযোগ করে একটু ঠান্ডা হলেই, রাজা মশায় আবার তাদের খবর নিতে এলেন। তাদের পোষাক দেখে অবধিই তিনি ভেবে নিয়েছেন যে 'না জানি এঁরা কত বড় রাজাই হবেন!' তারপর শেষে যখন তিনি গুপীকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, "আপনারা কোন দেশের রাজা?" তখন গুপী হাত যোড় করে তাঁকে বল্ল, "মহারাজ! আমরা কি রাজা হতে পারি? আমরা আপনার চাকর!"
গুপী সত্য কথাই বলেছিল, কিন্তু রাজার তাতে বিশ্বাস হল না। তিনি ভাবলেন, 'কি ভাল মানুষ, কেমন নরম হয়ে কথা বলে। যেমন বড় রাজা, তেমনি ভদ্রলোকও দেখছি।' তিনি তখন আর বিশেষ কিছু না বলে তাদের দুজনকে তাঁর সভায় নিয়ে এলেন। সেখানে সে দিন সেই দুটো লোকের বিচার হবে, – তিন দিন আগে যারা গিয়ে তাঁর শোবার ঘরে ঢুকেছিল। বিচারের সময় উপস্থিত, আসামী দুটোকে আনতে পিয়াদা গিয়েছে; কিন্তু তাদের আর কোথায় পাবে? এ তিন দিন তাদের ঘরে তালা বন্ধ ছিল, সেই তালা খুলে দেখা হল, সেখানে কেউ নাই, খালি ঘর পড়ে আছে।
তখন ত ভারী একটা ছুটা ছুটি হাঁকা হাঁকি পড়ে গেল। দারোগা মশাই বিষম ক্ষেপে গিয়ে পিয়াদাগুলোকে বকতে লাগলেন। পিয়াদারা হাত যোড় করে বল্ল, "হুজুর! আমাদের কোনো কসুর নাই; আমরা তালা দিয়ে রেখেছিলাম, তার উপর আবার আগাগোড়া দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলাম। ও দুটা ত মানুষ ছিল না, ও দুটা ছিল ভূত; নইলে এর ভিতর থেকে কি করে পালাল?"
এ কথায় সকলেরই বিশ্বাস হল! রাজা মশাইও প্রথমে দারোগার উপর রেগে তাঁকে কেটেই ফেলতে

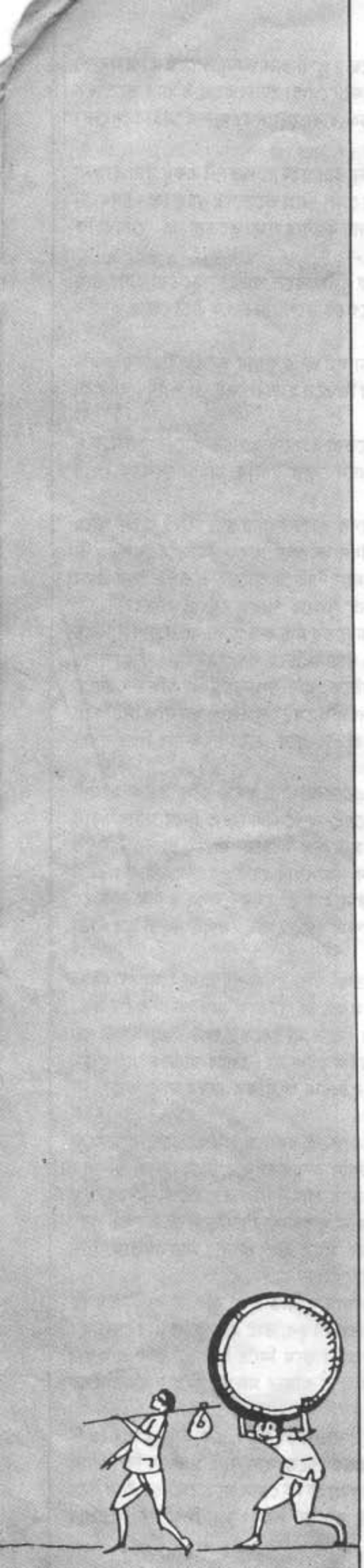

গিয়েছিলেন, শেষে ঐ কথা শুনে বল্লেন, "ঠিক! ও দুটো নিশ্চয় ভূত। আমার ঘরও ত বন্ধ ছিল, তার ভিতর এত বড় ঢোল নিয়ে কি করে ঢুকেছিল?"
তা শুনে সকলেই বলল, "হাঁ হাঁ, ঠিক ঠিক, ও দুটো ভূত!" বলতে বলতেই তাদের শরীর শিউরে উঠল, গা বেয়ে ঘাম পড়তে লাগল। তখন তারা বাঘার সেই ঢোলটির কথা মনে করে বল্ল, "মহারাজ! ভূতের ঢোল বড় সর্ব্বনেশে জিনিস! ওটাকে কখনো আপনার ঘরে রাখবেন না। ওটাকে এখনি পুড়িয়ে ফেলুন।"
রাজামশাইও বল্লেন, "বাপরে! ভূতের ঢোল ঘরে রাখব? এক্ষুণি ওটাকে এনে পোড়াও!"
যেই এ কথা বলা, অমনি বাঘা দু হাতে চোখ ঢেকে "হাউ হাউ হাউ হাউ" করে কেঁদে গড়াগড়ি দিতে লাগল!

সে দিন বাঘাকে নিয়ে গুপীর কি মুস্কিলই হয়েছিল। ঢোল পোড়াবার নাম শুনেই বাঘা কাঁদতে আরম্ভ করেছে, ঢোল এনে তাতে আগুন ধরিয়ে দিলে না জানি সে কি করবে! তখন, সেটা যে তারই ঢোল, সে কথা কি আর বাঘা সামলে রাখতে পারবে? কি সর্ব্বনাশ! এখন বুঝি ধরা পড়ে প্রাণটাই হারাতে হয়। গুপীর বড়ই ইচ্ছা হচ্ছিল যে বাঘাকে নিয়ে ছুটে পালায়। কিন্তু তার ত আর যো নাই; সভায় বসবার সময় যে সেই জুতাগুলো পা থেকে খুলে রাখা হয়েছে।
এদিকে কিন্তু বাঘার কান্ড দেখে সভাময় এক বিষম হুলস্থূল পড়ে গেছে। সবাই ভাবছে, বাঘার নিশ্চয় একটা ভারী অসুখ হয়েছে, আর সে বাঁচবে না। রাজবাড়ীর বৈদ্যি ঠাকুর এসে বাঘার নাড়ী দেখে যারপরনাই গম্ভীরভাবে মাথা নাড়লেন। বাঘাকে খুব করে জোলাপের ওষুধ খাইয়ে তার পেটে বেলেস্তারা লাগিয়ে দেওয়া হল। তারপর বৈদ্যি ঠাকুর বল্লেন যে, "এতে যদি বেদনা না সারে, তবে পিঠে আর একটা, তাতেও না সারলে দুপাশে আর দুটো বেলেস্তারা লাগাতে হবে।"
এ কথা শুনেই বাঘার কান্না তৎক্ষণাৎ থেমে গেল। তখন সকলে ভাবল যে, বৈদ্যি ঠাকুর কি চমৎকার ওষুদ্ই দিয়েছেন, দিতে দিতেই বেদনা সেরে গেছে।
যা হোক, বাঘা যখন দেখল যে তার কান্নাতে ঢোল পোড়াবার কথাটা চাপা পড়ে গেছে, তখন সেই বেলেস্তারার বেদনার ভিতরেই তার মনটা কতক ঠান্ডা হল। রাজামশায় তখন তাকে খুব যত্নের সহিত তার ঘরে শুইয়ে রেখে এলেন; গুপী তার কাছে বসে তার বেলেস্তারায় হাওয়া করতে লাগল। তারপর সকলে ঘর থেকে চলে গেলে, গুপী বাঘাকে বল্ল, "ছি, ভাই, যেখানে সেখানে কি এমন করে কাঁদতে আছে? দেখ দেখি, এখন কি মুস্কিলটা হল!" বাঘা বল্ল, "আমি যদি না কাঁদতুম, তা হলে ত এতক্ষণে আমার ঢোলকটি পুড়িয়ে শেষ করে দিত। এখন না হয় একটু জ্বলুনি সইতে হচ্ছে, কিন্তু আমার ঢোলকটা ত বেঁচে গেছে!"
বাঘা আর গুপী এমনি কথাবার্ত্তা বলছে। এদিকে রাজামশায় সভায় ফিরে এলে দারোগামশায় তাঁর কাণে কাণে বল্লেন, "মহারাজ, একটা কথা আছে, অনুমতি হয় ত বলি।" রাজা বল্লেন, কি কথা?" দারোগা বল্লেন, "মহারাজ, ঐ যে লোকটা গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদল, সে আর তার সঙ্গের ঐ লোকটা, – সেই দুই ভূত; আমি তাদের চিনতে পেরেছি।" রাজা বল্লেন, "তাইত হে, আমারও একটু যেন সেই রকমই ঠেকছিল। তা হলে ত বড় মুস্কিল দেখছি। বলো ত এখন কি করা যায়?"
তখন একথা নিয়ে সভার মধ্যে ভারী একটা কাণাকাণি শুরু হল। কেউ বল্ল, "রোজা ডাক, ও দুটোকে তাড়িয়ে দিক্।" আর একজন বল্ল, "রোজা যদি তাড়াতে না পারে, তখন ত সে দুটো ক্ষেপে গিয়ে একটা বিষয়ে কিছু করতে পারে। তার চেয়ে কেন রাত্রে ঘুমের ভিতরে ও দুটোকে পুড়িয়ে মারুন না।"
এ কথাটা সকলেরই খুব পছন্দ হল, কিন্তু এরমধ্যে একটু মুস্কিল এই দেখা গেল যে, ভূতদের পোড়াতে গেলে রাজবাড়িতেও তখন আগুন ধরে যেতে পারে। শেষে অনেক যুক্তির পর এই স্থির হল যে,একটা বাগান বাড়ীতে তাদের বাসা দেওয়া হবে; বাগানবাড়ী পোড়া গেলেও বিশেষ ক্ষতি হবে না। তখন রাজামশায় বল্লেন যে, "সেই ঢোলটাকেও তা হলে সেই বাগানবাড়ীতে নিয়ে রাখা যাক; বাগানবাড়ী পোড়াবার সময় এক সঙ্গে সকল আপদ চুকে যাবে।"
বাগানবাড়ী যাবার কথা শুনে গুপী আর বাঘা খুব খুসী হল। তারা ত জানে না যে এর ভিতরে কি ভয়ানক ফন্দি রয়েছে; তারা খালি ভাবল যে বেশ আরামে নিরিবিলি থাকা যাবে, সঙ্গীত চর্চ্চারও সুবিধা হতে পারে। জায়গাটি খুবই নিরিবিলি আর সুন্দর। বাড়ীটি কাঠের, কিন্তু দেখতে চমৎকার। সেখানে গিয়ে দেখতে দেখতে বাঘা ভাল হয়ে গেল। তখন গুপী তাকে বল্ল "ভাই, আর এখানে থেকে কাজ কি? চল আমরা এখান থেকে চলে যাই।" বাঘা বল্ল, "দাদা, এমন সুন্দর জায়গায় ত আর থাকতে পাব না, দু দিন এখানে রইলাম বা। আহা, আমার ঢোলকটি যদি থাকত!"
সেদিন বাঘা বাড়ীর এঘর ওঘর ঘুরে বেড়াচ্ছে, গুপী বাগানের এক জায়গায় বসে গুণগুণ করছে, এমন সময় হঠাৎ বাঘা ভয়ানক চাঁচামেচি ক'রে উঠল। তার সকল কথা বোঝা গেল না, খালি 'ও গুপী দা! ও গুপী দা!' ডাকটা খুবই শোনা যেতে লাগল। গুপী তখন ছুটে এসে দেখল যে, বাঘা তার সেই ঢোলটা মাথায় করে পাগলের মত নাচছে, আর যা তা আবোল তাবোল বলতে বলতে 'গুপী দা, গুপী দা' বলে চাঁচাচ্ছে। ঢোল পেয়ে তার এত আনন্দ হয়েছে যে সে আর কিছুতেই স্থির হতে পারছে না। গুছিয়ে কথাও বলতে পারছে না। এমনি করে প্রায় আধ ঘন্টা চলে গেলে পর বাঘা একটু শান্ত হয়ে বল্ল, "গুপী দা, দেখছ কি, এই ঘরে আমার ঢোলকটি – আরে কি মজা – হাঃ হাঃ হাঃ" বলে আবার সে মিনিট

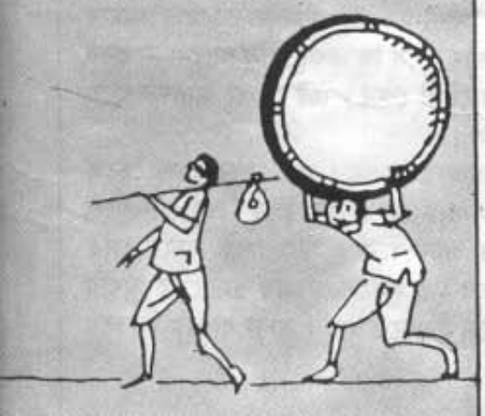

দশেক খুব নেচে নিল। তারপর সে বল্ল "দাদা, এত দুঃখের পর ঢোলকটি পেয়েছি একটা গান গাও, একটু বাজিয়ে নি।" গুপী বল্ল, "এখন নয় ভাই, এখন বড্ড খিদে পেয়েছে। খাওয়া দাওয়ার পর রাত্রে বারান্দায় বসে দুজনায় খুব করে গান বাজনা করা যাবে।"

রাজামশাই কিন্তু ঠিক করেছেন, সেই রাত্রেই তাদের পুড়িয়ে মারবেন। দারোগার উপর হুকুম হয়েছে যে, সেদিন সন্ধ্যার সেই বাগান বাড়ীতে মস্ত ভোজের আয়োজন করতে হবে। দারোগা মশায় পঞ্চাশ ষাট জন লোক নিয়ে সেই ভোজে উপস্থিত থাকবেন; খাওয়া দাওয়ার পর গুপী আর বাঘা ঘুমিয়ে পড়লে, তাঁরা সকলে মিলে এক সংগে সেই কাঠের বাড়ীর চারদিকে আগুন দিয়ে তাদের পালাবার পথ বন্ধ করবেন।

সেদিনকার খাওয়া বেশ ভাল মতেই হল। গুপী আর বাঘা ভাবল যে লোকজন চলে গেলেই তারা গান বাজনা আরম্ভ করবে, দারোগা মশাই ভাবলেন যে গুপী আর বাঘা ঘুমোলেই ঘরে আগুন দেবেন। তিনি তাদের ঘুম পাড়াবার জন্য বড়ই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। তাঁর ভাব দেখে যখন স্পষ্টই বুঝা গেল যে তারা না ঘুমালে তিনি সেখান থেকে যাবেন না, তখন গুপী বাঘাকে নিয়ে গিয়ে বিছানায় পড়ে নাক ডাকাতে লাগল।

একটু পরেই গুপী আর বাঘা দেখল যে লোক জন সব চলে গেছে, আর কারু সাড়া শব্দ নাই। তারপর আরেকটু দেখে, যখন মনে হল যে বাগান একেবারে খালি হয়ে গেছে, তখন তারা দুজনে বারান্দায় এসে ঢোল বাজিয়ে গান যুড়ে দিল।

এদিকে দারোগা মশায় তাঁর লোকদের বলে দিয়েছেন, 'তোরা প্রত্যেক দরজায় বেশ ভাল করে আগুন ধরাবি; খবরদার, আগুন ভাল করে না ধরলে চলে যাস্‌নি যেন।' তিনি নিজে গিয়েছেন সিঁড়িতে আগুন ধরাতে। আগুন বেশ ভাল মতই ধরেছে, দারোগা মশাই ভাবছেন 'এই বেলা ছুটে পালাই', এমন সময় বাঘার ঢোল বেজে উঠল, গুপী গান ধরে দিল। তখন আর দারোগা মশাই বা তাঁর লোকদের কারু সেখান থেকে নড়বার যো রইল না, সকলকেই পুড়ে মরতে হল। ততক্ষণে গুপী আর বাঘাও আগুন দেখতে পেয়ে, তাদের জুতার জোরে, তাদের ঢোল আর থলেটি নিয়ে সেখান থেকে চম্পট দিল। সে দিনকার আগুনে দারোগা মশাই ত পুড়ে মারা গিয়েছিলেনই, তাঁর দলের অতি অল্প লোকই বেঁচে ছিল। সেই লোকগুলো গিয়ে রাজামশাইকে এই ঘটনার খবর দিতে তাঁর মনে বড়ই ভয় হল। পরদিন আরো দু চারজন লোক রাজসভায় এসে বল্ল যে, তারা সেই আগুনের তামাসা দেখতে সেখানে গিয়েছিল; তারা তখন ভারী আশ্চর্য্য রকমের গান বাজনা শুনেছে, আর ভূত দুটোকে শূন্যে উড়ে পালাতে স্বচক্ষে দেখেছে। তখন যা রাজা মশায়ের কাঁপুনি! সে দিন আর তাঁর সভা করা হল না। তিনি তাড়াতাড়ি বাড়ীর ভিতরে এসে ভূতের ভয়ে দরজা এঁটে লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে রইলেন, এক মাসের ভিতরে আর বাইরে এলেন না।

এদিকে গুপী আর বাঘা সেই আগুনের ভিতর থেকে পালিয়ে একেবারে তাদের বাড়ীর কাছের সেই বনে এসে উপস্থিত হয়েছে, যেখানে প্রথমে তাদের দেখা হয়েছিল। তাদের বড় ইচ্ছা যে এত ঘটনার পর একবার তাদের মা বাপকে দেখে যায়। বনে এসেই বাঘা বল্ল, "গুপী দা, এইখানে না তোমায় আমায় দেখা হয়েছিল?" গুপী বল্ল, "হাঁ।" বাঘা বল্ল, "তবে, এমন জায়গায় এসে কি একটু গান বাজনা না করে চলে যেতে আছে?" গুপী বল্ল, "ঠিক বলেছ ভাই। তবে আর দেরী কেন? এই বেলা আরম্ভ করে দাও।" এই বলে তারা প্রাণ খুলে গান বাজনা করতে লাগল।

এর মধ্যে এক আশ্চর্য্য ঘটনা হয়েছে। একদল ডাকাত হাল্লার রাজার ভাণ্ডার লুটে, তার ছোট ছেলে দুটিকে সুদ্ধ চুরী করে নিয়ে পালিয়ে এসেছিল, রাজা অনেক সৈন্য নিয়ে তাদের পিছু পিছু প্রাণপণে ছুটেও তাদের ধরতে পারছিলেন না। গুপী আর বাঘা যখন গান ধরেছে ঠিক সেই সময়ে সেই ডাকাতগুলোও সেই বনের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সে গান একবার শুনলে ত আর তার শেষ অবধি না শুনে চলে যাবার যো নাই; কাজেই ডাকাতদের তখনি সেখানে দাঁড়াতে হল। সারা রাত্রের ভিতরে

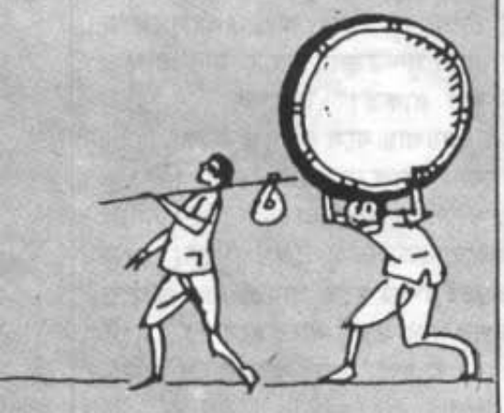

আর সে গান বাজনাও থামল না, ডাকাতদেরও সেখান থেকে যাওয়া ঘটল না। সকালে হাল্লার রাজা এসে অতি সহজেই তাদের ধরে ফেল্লেন। তারপর যখন তিনি জানলেন যে গুপী আর বাঘার গানের গুণেই তিনি ডাকাত ধরতে পেরেছেন তখন আর তাদের আদর দেখে কে? রাজকুমারেরাও বল্লেন, "বাবা এমন আশ্চর্য্য গান আর কখনো শোন নি; এদের সঙ্গে নিয়ে চল।" কাজেই রাজা গুপী আর বাঘাকে বল্লেন, "তোমরা আমার সঙ্গে চল। তোমাদের পাঁচশ টাকা করে মাইনে হল।"

এ কথায় গুপী যোড় হাতে রাজামশাইকে নমস্কার করে বল্ল, "মহারাজ, দয়া করে আমাদের দুদিনের ছুটি দিতে আজ্ঞা হোক। আমরা আমাদের পিতা মাতাকে দেখে তাঁদের অনুমতি নিয়ে আপনার রাজধানীতে গিয়ে উপস্থিত হব।" রাজা বল্লেন, "আচ্ছা, এ দুদিন আমরা এই বনেই বিশ্রাম করছি। তোমরা তোমাদের মা বাপকে দেখে দুদিন পরে এসে এইখানেই আমাদের পাবে।"

গুপীকে তাড়িয়ে অবধি তার বাবা তার জন্য বড়ই দুঃখিত ছিল, কাজেই তাকে ফিরে আসতে দেখে তার বড় আনন্দ হল। কিন্তু বাঘা বেচারার ভাগ্যে সে সুখ মিলে নি। তার মা বাপ এর কয়েকদিন আগেই মারা গিয়েছিল। গ্রামের লোকেরা তাকে ঢোল মাথায় করে আসতে দেখেই বল্ল, "ঐ রে! সেই বাঘা বেটা আসছে, আবার আমাদের হাড় জ্বালিয়ে মারবে; মার বেটাকে!" বাঘা বিনয় করে বল্ল, "আমি খালি আমার মা বাবাকে দেখতে এসেছি; দুদিন থেকেই চলে যাব, বাজাব টাজাব না।" সে কথা কি তারা শোনে? তারা দাঁত খিঁচিয়ে তার মা বাপের মৃত্যুর কথা বলে, এই বড় বড় লাঠি নিয়ে তাকে মারতে এল, সে প্রাণপণে ছুটে পালাতে পালাতে ইট মেরে তার পা ভেঙে মাথা ফাটিয়ে রক্তারক্তি করে দিল।

গুপী তাদের ঘরের দাওয়ায় বসে তার বাপের সঙ্গে কথা বলছিল, এমন সময় সে দেখল, যে বাঘা পাগলের মত হয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে ছুটে আসছে; তার কাপড় ছিঁড়ে ফালি ফালি আর রক্তে লাল হয়ে গেছে। অমনি সে তাড়াতাড়ি বাঘার কাছে ছুটে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "কি হয়েছে! তোমার এ দশা কেন?" গুপীকে দেখেই বাঘা একগাল হেসে ফেলেছে। তারপর সে হাঁপাতে হাঁপাতে বল্ল, "দাদা, বড্ড বেঁচে এসেছি। মুর্খগুলো আরেকটু হলেই আমার ঢোলকটি ভেঙ্গে দিয়েছিল।" গুপীদের বাড়ী এসে গুপীর যত্নে আর তার মা বাপের আদরে বাঘার দুদিন যতটা সম্ভব সুখেই কাটল। দুদিন পরে গুপী তার মা বাপের কাছ থেকে বিদায় নিবার সময় বলে গেল, "তোমরা তয়ের হয়ে থাকবে; আমি আবার ছুটি পেলেই এসে তোমাদের নিয়ে যাব।"

তারপর কয়েক মাস চলে গিয়েছে। গুপী আর বাঘা এখন হাল্লার রাজার বাড়ীতে পরম সুখে বাস করে। দেশে বিদেশে তাদের নাম রটে গিয়েছে, – 'এমন ওস্তাদ আর কখনো হয় নি, হবেও না!' রাজা মশাই তাদের ভারী ভালবাসেন; তাদের গান না শুনে একদিনও থাকতে পারেন না। নিজের দুঃখ সুখের কথা সব গুপীর কাছে বলেন। এক দিন গুপী দেখল রাজা মশায়ের মুখখানি বড়ই মলিন। তিনি ক্রমাগতই যেন কি ভাবছেন, যেন তাঁর কোনো বিপদ হয়েছে। শেষে একবার তিনি গুপীকে বল্লেন, "গুপী, বড় মুস্কিলে পড়েছি, কি হবে জানি না। শুণ্ডীর রাজা আমার রাজ্য কেড়ে নিতে আসছে।"

শুণ্ডীর রাজা হচ্ছেন সেই তিনি, যিনি গুপী আর বাঘাকে পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিলেন। তাঁর নাম শুনেই গুপীর মনে একটা চমৎকার মতলব এল। সে তখন রাজা মশাইকে বল্ল, "মহারাজ! এর জন্য কোন চিন্তা করবেন না। আপনার এই চাকরকে হুকুম দিন, আমি এ থেকে হাসির কান্ড করে দিব।" রাজা হেসে বল্লেন, "গুপী তুমি গাইয়ে বাজিয়ে মানুষ, যুদ্ধের ধারও ধার না, তার কিছু বোঝও না। শুণ্ডীর রাজার বড় ভারী ফৌজ, আমি কি তার কিছু করতে পারি?" গুপী বল্ল, "মহারাজ, হুকুম পেলে একবার চেষ্টা করে দেখতে পারি। ক্ষতি ত কিছু হবে না।" রাজা বল্লেন, "তোমার যা ইচ্ছা তাই তুমি করতে পার।" এ কথায় গুপী যারপরনাই খুসী হয়ে বাঘাকে ডেকে পরামর্শ করতে লাগল।

গুপী আর বাঘা সে দিন অনেকক্ষণ ধরে পরামর্শ করেছিল। বাঘার তখন কতই উৎসাহ। সে বল্ল, "দাদা এবারে আমরা দুজনে মিলে একটা কিছু করবই করব। আমার শুধু এক কথায় একটু ভয় হচ্ছে; হঠাৎ যদি প্রাণ নিয়ে পালাবার দরকার হয় তবে হয়ত আমি জুতার কথা ভুলে গিয়ে সাধারণ লোকের মত কষে ছুট দিতে যাব, আর মার খেয়ে সারা হব। এমনি করে দেখ না সেবারে আমাদের গাঁয়ের মুর্খগুলোর হাতে আমার কি দশা হল!"

যা হোক, গুপীর কথায় বাঘার সে ভয় কেটে গেল, আর পরদিন থেকেই তারা কাজে লাগল। দিন কতক ধরে রোজ রাত্রে তারা শুণ্ডী চলে যায়, আর রাজ বাড়ীর আশপাশে ঘুরে সেখানকার খবর নেয়। যুদ্ধের আয়োজন যা দেখতে পেল সে বড়ই ভয়ংকর; এ আয়োজন নিয়ে এরা হাল্লায় গিয়ে উপস্থিত হলে আর রক্ষা নাই। রাজার ঠাকুর বাড়ীতে রোজ মহা ধুমধামে পূজা হচ্ছে। দশ দিন এমনিতর পূজা দিয়ে, ঠাকুরকে খুসী করে তারা হাল্লায় রওয়ানা হবে।

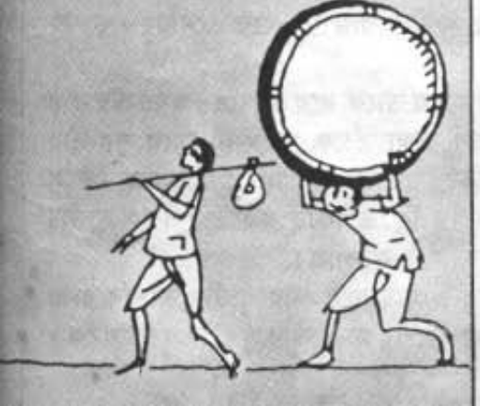

গুপী আর বাঘা এর সবই দেখল। তারপর একদিন তাদের ঘরে বসে, দরজা এঁটে, সেই ভূতের দেওয়া থলিটিকে বল্ল, "নূতন ধরনের মিঠাই চাই, খুব সরেশ।" সে কথায় থলির ভিতর থেকে মিঠাই যা বেরুল, সে আর বলবার নয়। তেমন মিঠাই কেউ খায় নি, চোখেও দেখে নি। সেই মিঠাই নিয়ে বাঘা আর গুপী শুণ্ডীর রাজার ঠাকুর বাড়ীর বিশাল মন্দিরের চূড়ায় গিয়ে বসল। নীচে খুব পূজার ধূম-ধূপ, ধূনা, শঙ্খ, ঘন্টা কোলাহলের সীমা নাই, আশ্গিনায় লোকে লোকারণ্য। সেই সব লোকের মাথার উপরে ঝড়াৎ করে মিঠাইগুলো ঢেলে দিয়ে বাঘা, আর গুপী মন্দিরের চূড়া আঁকড়ে বসে তামাসা দেখতে লাগল। অন্ধকারের মধ্যে সেই ধূপ ধূনা আর আলোর ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে কেউ তাদের দেখতে পেল না।

মিঠাইগুলো আঙিনায় পড়তেই অমনি কোলাহল থেমে গেল। অনেকেই লাঠিয়ে উঠল, কেউ কেউ চেঁচিয়ে ছুটও দিল। তারপর দুচারজন সাহসী লোক কয়েকটা মিঠাই তুলে, আলোর কাছে নিয়ে ভয়ে ভয়ে দেখতে লাগল। শেষে তাদের একজন চোখ বুঁজে তার একটু মুখে পুরে দিল। দিয়েই তার কথাবার্ত্তা নাই – সে দু হাতে আঙিনা থেকে মিঠাই তুলে খালি মুখে দিচ্ছে আর নাচছে আর আহ্লাদে চ্যাঁচাচ্ছে। তখন সেই আঙিনা শুদ্ধ লোক মিঠাই খাবার জন্য পাগলের মত কাড়াকাড়ি আর কিচিরমিচির করতে লাগল।

এদিকে কয়েক জন ছুটে গিয়ে রাজামশাইকে বলেছে যে, "মহারাজ! ঠাকুর আজ পূজায় তুষ্ট হয়ে স্বর্গ থেকে প্রসাদ পাঠিয়ে দিয়েছেন। সে যে কি অপূর্ব্ব প্রসাদ, সে কথা আমরা বলতেই পারছি না।" সে কথা শুনবামাত্রই রাজামশাই প্রাণপণে কাছা গুঁজতে গুঁজতে উর্দ্ধশ্বাসে এসে ঠাকুর বাড়ীতে উপস্থিত হলেন।

কিন্তু হায়! ততক্ষণে সব প্রসাদ শেষ হয়ে গিয়েছিল। সমস্ত উঠান ঝাঁট দিয়েও রাজামশাইয়ের জন্য একটু প্রসাদের গুঁড়ো পাওয়া গেল না। তখন তিনি ভারী চটে গিয়ে বল্লেন, "তোমাদের কি অন্যায়! পূজা করি আমি, আর প্রসাদ খেয়ে শেষ কর তোমরা! আমার জন্যে একটু গুঁড়োও রাখ না। তোমাদের সকলকে ধরে শূলে চড়াব!" এ কথায় সকলে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে যোড়হাতে বল্ল, "দোহাই মহারাজ! আপনার প্রসাদ কি আমরা খেয়ে শেষ করতে পারি? বাপরে! আমরা খেতে না খেতেই ঝাঁ করে কোনখান দিয়ে ফুরিয়ে গেল! আজ আমাদের প্রসাদগুলো আপনি মাপ করুন; কালকের যত প্রসাদ সব মহারাজ একাই খাবেন!" রাজা তাতে বল্লেন, "আচ্ছা তাই হবে। খবরদার মনে থাকে যেন।"

পরদিন রাজামশাই প্রসাদ খাবেন, তাই এক প্রহর বেলা থাকতেই তিনি ঠাকুর বাড়ীর আঙিনায় এসে আকাশের পানে তাকিয়ে বসে আছেন। আর সকলে ভয়ে ভয়ে একটু দূরে বসে তাঁকে ঘিরে তামাসা দেখছে। আজ পূজার ঘটা অন্য দিনের চেয়ে শতগুণ; সবাই ভাবছে, দেবতা তাতে খুসী হয়ে রাজা মশাইকে আরো ভাল প্রসাদ দিবেন।

রাত দুপুরের সময় গুপী আর বাঘা আরো আশ্চর্য্য রকমের মিঠাই নিয়ে এসে মন্দিরের চূড়ায় বসল। আজ তাদের পরনে খুব জমকালো পোষাক মাথায় মুকুট, গলায় হার, হাতে বালা, কানে কুণ্ডল; তারা দেবতা সেজে এসেছে। ধোঁয়ার জন্য কিছু দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু তবু রাজামশাই আকাশের পানে তাকিয়ে আছেন। এমন সময় গুপী আর বাঘা হাসতে হাসতে তাঁর উপরে সেই মিঠাইগুলো ফেলে দিল। তাতে রাজামশাই প্রথমে একটা চীৎকার দিয়ে তিন হাত লাফিয়ে উঠলেন, তারপর তাড়াতাড়ি সামলিয়ে গিয়ে, দু হাতে মিঠাই তুলে মুখে দিতে লাগলেন, আর ধেই ধেই করে নাচনটা যে নাচলেন! এমন সময় গুপী আর বাঘা হঠাৎ মন্দিরের চূড়া থেকে নেমে এসে রাজার সামনে দাঁড়াল। তাদের দেখে সকলে 'ঠাকুর এসেছেন' 'ঠাকুর এসেছেন' বলে কে আগে গড় করবে ভেবে ঠিক পায় না। রাজামশাই ত লম্বা হয়ে মাটিতে পড়েই রয়েছেন, আর খালি মাথা ঠুকছেন। গুপী তাঁকে বল্ল, "মহারাজ! তোমার নাচ দেখে আমরা বড়ই তুষ্ট হয়েছি; এস, তোমার সঙ্গে কোলাকুলি করি।" রাজা তা শুনে যেন হাতে স্বর্গ পেলেন; বেতার সঙ্গে কোলাকুলি সে কি কম সৌভাগ্যের কথা?

কোলাকুলি আরম্ভ হল; সকলে 'জয় জয়' বলে চ্যাঁচাতে লাগল। সেই অবসরে গুপী আর বাঘা রাজামশাইকে খুব করে জড়িয়ে ধরে বল্ল, "এখন তবে আমাদের ঘরে যাব!" বলতে বলতেই তারা তাঁকে শুদ্ধ একেবারে এসে তাদের নিজের ঘরে উপস্থিত। ঠাকুরবাড়ীর আঙিনায় সেই লোকগুলো অনেকক্ষণ ধরে হাঁ করে আকাশের পানে চেয়ে রইল, তারপর যখন রাজামশাই আর ফিরলেন না, তখন তারা যে যার ঘরে এসে বল্ল, "কি আশ্চর্য্যই দেখলাম! রাজামশায় সশরীরে স্বর্গে গেলেন! দেবতারা নিজে তাঁকে নিতে এসেছিলেন!"

এদিকে রাজামশাই গুপী আর বাঘার কোলে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন, তাদের ঘরে এসেও অনেকক্ষণ তাঁর জ্ঞান হয় নি। ভোরের বেলায় তিনি চোখ মেলে দেখলেন যে সেই দুটো ভূত তাঁর মাথার কাছে বসে আছে। অমনি তিনি তাদের পায়ে পড়ে কাঁপতে কাঁপতে বল্লেন, "দোহাই বাবা! আমাকে খেয়ো না। আমি দুশ মোষ মেরে তোমাদের পূজা করব।"

গুপী বল্ল, "মহারাজ আপনার কোন ভয় নাই। আমরা ভূতও নই, আপনাকে খেতেও যাচ্ছি না।" রাজামশাইয়ের কিন্তু তাতে একটুও ভরসা হল না। তিনি আর কোনো কথা না বলে মাথা গুঁজে বসে কাঁপতে লাগলেন।

এদিকে বাঘা এসে হাল্লার রাজাকে বল্ল, "কাল রাত্রে আমরা শুণ্ডীর রাজাকে ধরে এনেছি; এখন কি আজ্ঞা হয়?" হাল্লার রাজা বল্লেন, "তাকে নিয়ে এস।"

দুই রাজার যখন দেখা হল, তখন শুণ্ডীর রাজা বুঝতে পারলেন যে তাঁকে ধরে এনেছে। হাল্লা জয় করা ত তাঁর ভাগ্যে ঘটলই না, এখন প্রাণটিও যাবে। কিন্তু হাল্লার রাজা তাঁকে প্রাণে না মেরে শুধু তাঁর রাজ্যই কেড়ে নিলেন। তারপর তিনি গুপী আর বাঘাকে বল্লেন, "তোমরাই আমাকে বাঁচিয়েছ, নইলে হয়ত আমার রাজ্যও যেত প্রাণও যেত। আমি আর তোমাদের কি উপকার করতে পারি? শুণ্ডীর রাজ্যের অর্দ্ধেক আর আমার দুটি কন্যা তোমাদের দুজনকে দান করলাম।"

তখন খুবই একটা ধূমধাম হল। গুপী আর বাঘা হাল্লার রাজার জামাই হয়ে আর শুণ্ডীর অর্দ্ধেক রাজ্য পেয়ে পরম আনন্দে সংগীতের চর্চ্চা করতে লাগল। গুপীর মা বাপের মান্য আর সুখ তখন দেখে কে?

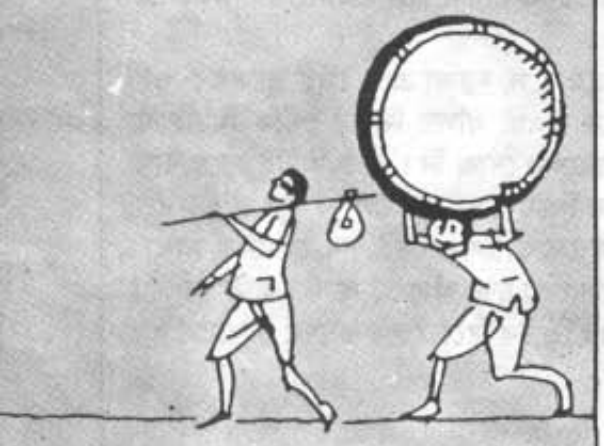

গল্পের নামাঙ্কনটি ছাড়া অন্য স্কেচগুলি উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর মূল ছবি অবলম্বনে এঁকেছেন সত্যজিৎ রায়।সৌজন্য: সন্দেশ ১ বর্ষ: ৬ সংখ্যা

বিষয় গুপীবাঘা

সত্যজিৎ রায়ের সাক্ষাৎকার

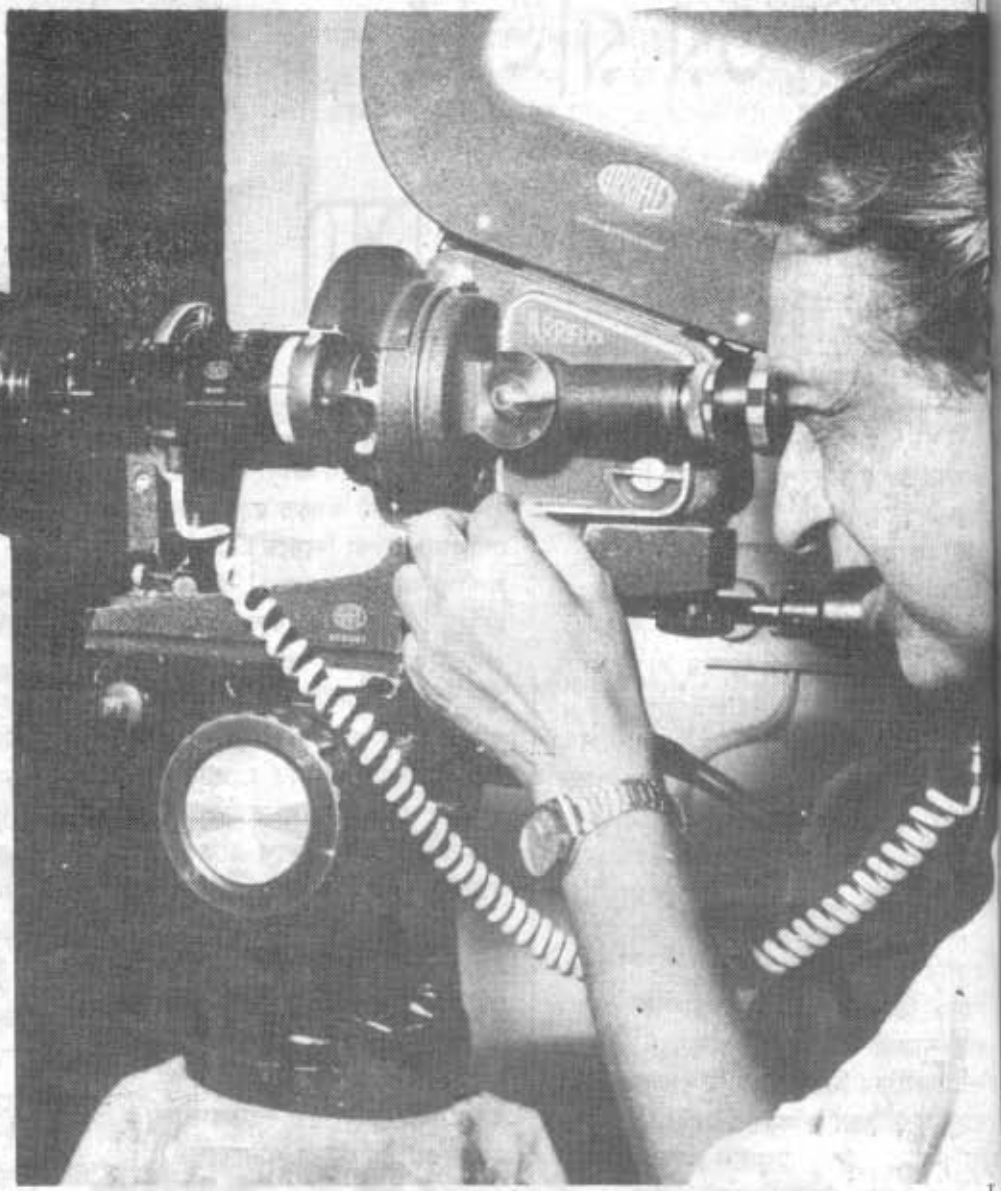

'কলকাতা' পত্রিকা দ্বিতীয় বর্ষ, তৃতীয় ও চতুর্থ যুগ্ম সংখ্যাটি (২ মে, ১৯৭০) প্রকাশিত হয়েছিল 'সত্যজিৎ রায় বিশেষ সংখ্যা' রূপে। পত্রিকাটির মূল্যবান সংযোজন ছিল করুণাশঙ্কর রায় গৃহীত সত্যজিৎ রায়ের দীর্ঘ সাক্ষাৎকার। ঐ সাক্ষাৎকারের 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' ছবিটির প্রাসঙ্গিক অংশ এখানে পুনর্মুদ্রণ করা হল। সৌজন্য : জ্যোতির্ময় দত্ত; সম্পাদক কলকাতা।

'গুপী গাইন বাঘা বাইন' প্রসঙ্গে আরও একটি সাক্ষাৎকার মূল্যবান মনে হওয়ায়, সেটিও 'টেলিভিশন' পত্রিকার পাঠকদের জন্যে পুনর্মুদ্রণ করা হল। সাক্ষাৎকারটি নিয়েছিলেন গুরুদাস ভট্টাচার্য। প্রকাশিত হয়েছিল 'দর্পণ' সাপ্তাহিক পত্রিকার ৯ মে ১৯৬৯ তারিখের সংখ্যায়।

সাক্ষাৎকার : ১

● আপনি বোধহয় লক্ষ করে থাকবেন যে সাধারণত আমাদের দেশের চিত্রসমালোচনায় আপনার ছবির মধ্যে গল্পটাকে গল্প হিসেবে না নিয়ে তার গূঢ় তাৎপর্য অন্বেষণে সবাই ব্যস্ত।

সত্যজিৎ : সেটা প্রায় গা সওয়া হয়ে গেছে, তবে এটাতে একটু বাড়াবাড়ি হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে।

● এই যে ধরুন দুটি দেশ, একটা যুদ্ধবাদী একটা শান্তিপ্রিয় – চ্যাপলিন যেমন 'গ্রেট ডিক্টেটর'-এ স্পষ্টই একটা ডায়ট্রাইব লক্ষ করেছিলেন, আপনি এখানে 'হাল্লা চলেছে যুদ্ধে' গানটির সঙ্গে ক্যামেরা পাস করে দিয়ে কমিক্যাল প্রোপোরশনে দেখালেন, তার সঙ্গে কোনও অ্যান্টি-নাটসি ফিলিং আছে কিনা, এ-নিয়ে নানা কথাবার্তা হয়েছে।

সত্যজিৎ : হ্যাঁ জানি। কিন্তু একটা কথা তো মনে রাখতে হবে যে যখন ১৯১৫-তে গপ্পোটা বেরিয়েছিল, তখনো তাতে দুটো রাজ্য ছিল – একটা শান্তিপ্রিয়, একটা যুদ্ধপ্রিয় রাজ্য। তাদের মধ্যে সেই যুদ্ধটা থামানো হল, তারপর শান্তি এল, তারপর দুই রাজার মিলন হল। মূল গল্পটাই তা-ই। এখন আজকের দিনে সে-গল্প পড়লে স্বভাবতই সাধারণ লোকের মনে অনেক রাজ্যের সঙ্গে

আইডেন্টিফাইড হয়ে যেতে পারে। আমি কিন্তু এসব কিছু ভেবে করিনি।

● 'গু গা বা বা' বিষয়ে অনেকে অভিযোগ করেন যে এর শুরু ফ্যান্টাসিতে, শেষ ফেব্‌লে। প্রথমে আজগুবি গল্পের লজিকে চলেছে, কিন্তু মাঝখানে বক্তব্য, বা নীতিকথা এসে পড়ায় কাহিনীটি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেছে। গুপী বাঘার গানগুলিও তার প্রমাণ।

সত্যজিৎ : গুপী বাঘা যখন কথা বলছে, তখন তাদের মধ্যে কোনও বক্তব্য আছে বলা যায় না। শুধু ফংশন্যাল কথাবার্তা বলে গেছে। শুধু যখন গান গেয়েছে, গুপী তখন প্রায় ব্রুবাদুরের একটা ফংশন মেনে চলেছে আর কি! কমেন্ট করেছে সিচুয়েশনের ওপর। [আর ফ্যান্টাসি এবং ফেব্‌লের কথা যদি বলেন] দুটোতে খুব একটা ডিমারকেশন করা হয় কিনা আমি ঠিক জানি না। আমার মনে হয় সব চাইতে ভাল .... কোনও ক্যাটিগরিতে না ফেলা – জজ ইট অ্যাজ ইট ইজ। সেটাই আমার মনে হয় সব চাইতে ভাল। ফ্যান্টাসি, মানে ফেব্‌লের মধ্যেও যদি অলৌকিক ঘটনা, ম্যাজিক ইত্যাদি থাকে, তাহলে দুটো জিনিসই আবার – মানে – ন্যাচারালি – আমাকে গল্পটার মূল কাঠামোটা গড়ে তারপর তো এগোতে হয়েছে। সেখানে গুপী একটা গায়ক চরিত্র হচ্ছে – তার গানগুলো আমাকে লিখতে হচ্ছে এবং তাহলে গানগুলো লিখলে তার বক্তব্য কী হবে সেটা স্বভাবতই এসে যাচ্ছে। এখন, একটা যুদ্ধে একটা সৈন্যদল অগ্রসর হচ্ছিল, সেখানে তারা এসে গান, গেয়ে থামাচ্ছে। এখন, সেখানে তো 'দেখো রে নয়ন মেলে জগতের কী বাহার' সে-গান দিতে পারি না। কাজেই সেখানে স্বভাবতই একটা অ্যাপ্ট, অ্যাপ্রোপ্রিয়েট গান দিতে হয়েছে। এখন, সেখানে আস্তে-আস্তে ঐ জিনিসটা ইভলভ করেছে। তাহলে যুদ্ধ সম্বন্ধে একটা কমেন্ট করুক না। .... জিনিসটাকে আরও নাটকীয়, আরও রেলেভ্যান্ট করবার জন্য, আরও পয়েন্টেড করবার জন্য – যেমন মন্ত্রী যখন তাদের গ্রেপ্তার করার হুকুম দিল – তখন, যখন মন্ত্রীকে 'ওরে থাম, থাম মন্ত্রীমশাই, ষড়যন্ত্রী মশাই' বলে গান গাইল, তখন সেখানে মন্ত্রী সম্পর্কে একটা কমেন্ট তাকে করতেই হয়েছে – মানে, সেই সিচুয়েশন অনুযায়ী তাকে গান করতে হয়েছে। স্বভাবতই সেটা কমেন্টের পর্যায়ে এসে পড়েছে। .... কিন্তু গানটা যখন আসছে, জিনিসটা স্টাইলাইজেশনের পর্যায়ে উঠে যাচ্ছে – যখনই সেখানে অপেরাটিক ফর্ম এসে যাচ্ছে বা যাত্রার ফর্ম এসে যাচ্ছে, ব্রুবাদুরের ট্রেডিশনটা চলে আসছে, তখনই তারা কমেন্ট করছে।

● আচ্ছা 'গু গা বা বা'-ই তো আপনার প্রচলিত অর্থে প্রথম মিউজিক্যাল ছবি, যার আবহ-সংগীত আপনি রচনা করেছেন? এই সংগীতের ক্ষেত্রে মূল লক্ষ্য কী ছিল?

সত্যজিৎ : খানিকটা লক্ষ্য ছিল প্রথমত লোকসংগীত তো বটেই। সব মিলিয়ে ভারতীয় মেজাজটা – বাংলার গ্রাম্য মেজাজটা রাখা। কেননা গুপী যখন বাংলাদেশের ভূতের রাজার থেকে বর পেয়েছে তখন গানের মধ্যে বাংলা ভাষাটা থাকলে ক্ষতি কী? কিন্তু দুটো গান বলতে পারেন যে রাগের ওপর বেস করা, একটা তো ভৈরবী প্রথমে আছে – তারপর 'ওরে বাবা দ্যাখো চেয়ে'। ওখানে আবার মডিউলেশন আছে, প্রথম দিকটা ভূপালী, পিওর ক্লাসিক্যাল রাগের ওপর বেস করা। সেকেন্ড পোরশনে গানটা [যখন] মডিউলেট করছে সেখানে মেজাজটা আবার ফোক-এর দিকে চলে যায় – 'ওরে হাল্লা রাজার সেনা, তোরা যুদ্ধ করে করবি কী তা বল', এই অংশটায়। এখানে গানটা দুটো সেকশনে রয়েছে। তারপর ন্যাচারালি মহারাজকে যখন প্রথম গান শোনাচ্ছে, তার মধ্যে প্রথম লাইনে একটা গ্রাম্য ফোক সং – মানে কোনও এমন গান একটাও নেই যেটা একেবারে চেনা-জানা, ফোক সঙের সুর বসানো। ফোক-এর একটা বেসিক মেজাজকে ধরা হচ্ছে কতগুলি ছোটোখাটো কাজের মধ্য দিয়ে।

● ভৈরবী কোন গানটির কথা বলেছেন?

সত্যজিৎ : প্রথম গানটা একেবারে।'দেখো রে নয়ন মেলে'। যখন বর পেয়ে গাইবে তখন পুরো ভৈরবীর মেজাজটা যাতে প্রকাশিত হয় – যে-জিনিসটা আয়ত্তের বাইরে ছিল সেটা তখন আসছে এবং তারপরে .... একটা গানে আমি একেবারে পুরো কর্ণাটকী মেজাজ এনেছি, প্যারোডিস্টিক চালে বলতে পারেন, যেটা 'ওরে বাঘা রে, গুপী রে' – যেখানে লাস্টে ভরতনাট্যমের নেক-মুভমেন্ট করতে

করতে ওরা পালায় আর কী। সেটা পুরো কর্ণাটকী, পারোডিস্টিক বলতে পারেন। অন্য কোনটা [সে-রকম] নয়। তারপর অবশ্য ইনস্ট্রুমেন্টেশনে অর্কেস্ট্রেশনে পুরো লোকসঙ্গীত একটা শৃধু আছে, যেটা জেলে বসে বসে গাইছে, যেটাতে রাজাদের নাচ থেমে যায় আর কী – 'দেখো রাজা – দুঃখ কিসে যায়।' .... সে-গানটাতে শৃধু আমি দুটো ইনস্ট্রুমেন্ট ইউজ করেছি – একটা দোতারা আর একটা ভায়োলিন। ভায়োলিনটাকে বাজানো হয়েছে একটা পূর্ববঙ্গের ফোক ইনস্ট্রুমেন্টের মত করে – সারিন্দার মত করে। আর সব গানে, যেহেতু একটা বেশ জমকালো অ্যাটমসফিয়ার আছে, আমি তার সঙ্গে যেতে হবে বলে বেশ হেভিলি অর্কেস্ট্রেটেড করেছি। বেশ দিশি-বিলিতি মেশানো যন্ত্র আছে, ভায়োলিন, চেলো সবই আছে – তার সঙ্গে দোতারা-একতারা। .... এটা আমরা অবশ্য অনেকদিন থেকেই চেষ্টা করছি। আমার মনে হয় যে মিউজিকটা যদি এমন একটা বেসিস থেকে ধরা যায়, এমন ফন্ডামেন্ট্যাল থেকে, যেখানে আমি দিশি-বিলিতি একেবারে ইচ্ছে মত মেশাতে পারি এবং মেশানো সত্ত্বেও সেটা এসেনসিয়্যালি মিউজিকই থেকে যায়।

● মূল ভারতীয় সঙ্গীতই থেকে যায়?

সত্যজিৎ : মূল মেজাজটা ভারতীয় থাকছে। তার মধ্যে একেকটা গানে, যেমন 'মহারাজা তোমারে সেলাম', এই গানটায় একটা জিনিস করা আছে, যেটা কম ভারতীয় ব্যাকগ্রাউন্ড গানের [আছে] – একেবারে এক কী থেকে আরেকটা কী-তে চলে গেছে। দেয়ার ইজ এ মডিউলেশন ... কিন্তু সেটা এমন স্বচ্ছন্দে গেছে বলে আমার মনে হয় যে সেটাকে কখনো বিলিতি মনে হয় না। যেহেতু গানের মুডটা সেখানে চেঞ্জড হচ্ছে। এবং মডিউলেশনটা সেখানে জস্টিফাইড হয়ে যাচ্ছে।

● দু-একজন বলেছেন, ঐ যে গুপী প্রথম গানটা গাইল রাজার সামনে এসে, 'মোরা বাংলা দেশের থেকে এলাম' – এর আগে তো আপনি কোনও বিশেষ দেশ, পৃথিবীর কোনও বিশেষ সময়ের সঙ্গে চিহ্নিত করছিলেন না আপনার রাজাকে, এই মুহূর্তে।

সত্যজিৎ : প্রথম দৃশ্যটা কি বাংলা দেশ বলে মনে হয় না? ঐ যে বামন পন্ডিতের দল বসে পাশা-টাশা খেলছে, ওটা কিন্তু আমি ভীষণভাবে বাংলাদেশ ভেবে করেছি।

● কিন্তু আমি বলছি, যেমন ধরুন আপনি ঝুন্ডি-শুন্ডী এই ধরনের নামগুলো তো ব্যবহার করেছেন।

সত্যজিৎ : উপেন্দ্রকিশোরে শুন্ডী এবং হাল্লা ছিল। তবে ঐ শুন্ডী – ঐ কনফিউশনটা ছিল না।

● গুপী এবং বাঘা যখন গান গাইতে আরম্ভ করল, সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে ইনট্রোডিউস করল, আমরা বাংলা দেশ থেকে এলাম। হুন্ডি শুন্ডী ঝুন্ডি কোনটাই কোন দেশ কোন সময়ের ব্যাপার নয়। সেটা করলেন কেন? .... আমার মনে হয়েছে, বাংলা দেশের চাইতেও যেটার উপর জোর দিয়েছেন, সেটা বাংলা ভাষা। ঐ ভাষার কথাটা বারবার আসছে।

সত্যজিৎ : হ্যাঁ, ভাষার কথাটা এইজন্য এনেছি, কেননা তার পরে সেনটেন্সেই বলা হয়েছে যে আমরা যদিও বাংলা ভাষা ছাড়া অন্য ভাষা জানি না, কিন্তু আমরা এমন একটা ভাষা জানি যেটা দেশ-কাল-পাত্রের ওপরে। যে-ভাষাটা ইউনিভার্স্যাল। সেটা হচ্ছে গানের ভাষা। এইটে এস্টাবলিশ করতেই আমি বাংলা ভাষার প্রসঙ্গটা এনেছি।

● এর সঙ্গে আপনি কি ঐ শুন্ডীতে যে কথা বলতে পারে না, তার কোনও যোগ মনে-মনে ভেবেছিলেন? যে, এরা এই ভাষায় গানটা করছে এবং বলছে যে আরেকটা ভাষা আছে উঁচুস্তরের।

সত্যজিৎ : নিশ্চয়ই, একশোবার। তারা তো জানে না যে এখানে লোকেরা কী ভাষা বুঝবে, কাজেই কথা বলার ব্যাপারে তাদের এমনি একটা মুশকিল আছে। কিন্তু গান, গান জিনিসটার এমন একটা এপীল আছে, সেটা দেশোত্তর, কালোত্তর। ... সব সময় যে-প্রব্লেমটা হয়: এই যে সভায় গান গাইবে সেটা কী বিষয়ে গাইবে। এটা একটা ভীষণ প্রব্লেম। গল্পে তো সেটা বলা হয়নি। সেটা তৈরি করতে হবে। না, এই ধরনের – প্রথমে একটা হিউমিলিটির ফিলিং – আমরা বাংলা দেশ থেকে এলাম, আমরা সাদাসিধে মানুষ। আমরা দেশে-দেশে যাই, আমাদের ভাষা তো তোমরা বুঝবে না। কিন্তু কথা যখন বলব তখন হয়ত না-ও বুঝতে [পারো], কিন্তু আশা করি আমরা গান যখন গাইব তখন না-বুঝলেও তোমাদের কান দিয়ে হৃদয়ে প্রবেশ করবে। এইটুকু। এইজন্য প্রথমে গানের থিমটাকে বের করে নিতে হয় সব সময়। এই যে গান গাইবে – কী বিষয়ে গান গাইবে? ওটা তো ভীষণ একটা প্রব্লেম মিউজিক্যালে। অপেরাতে সুবিধে আছে। অপেরাতে গানের মধ্যেই প্লটটাকে এগুতে হচ্ছে। এখানে তো তা নয়। এখানে প্লট কিন্তু গান গেয়ে হচ্ছে না। ইনডিপেন্ডেন্টলি এগোচ্ছে। ... এইটেই হচ্ছে প্রব্লেম। এটা আমাকে আর কখনও ফেস করতে হয় নি। এটা এখানেই হল এবং এইভাবেই আমার মনে হল অনেক ভেবে-ভেবে। কেননা কোনও মডেল সত্যি করে পাওয়া যায় না। এক আমেরিকান, সত্যি বলতে আমেরিকান মিউজিক্যাল কমেডি ছাড়া কোনও মডেল নেই।

● আচ্ছা আপনার যে 'গু গা বা বা'-র ভূতের বর দেবার দৃশ্য – তাতে যে – নাচটা রয়েছে, এটা সম্পর্কে দু-একজনের বক্তব্য যে

সত্যজিৎ : লম্বা হয়েছে।

● না – টু কালচারস, তার একটা সর্ট অব সারটোরিয়্যাল – দেখালেন – ফ্ল্যাশেস অব টু কালচারস – টিকিওয়ালা ভূতেরা এবং সেই প্রসঙ্গে ভূশণ্ডীর মাঠের ভূতেরা। তারা মিলে লড়াই করছে

সত্যজিৎ : না, তারা কিন্তু পরস্পরের সঙ্গে লড়াই করছে না, এটা ভুল ধারণা। তারা নিজেদের মধ্যে মারামারি করছে। ...

● যখন আপনি একটা বিশেষ সময়ের কতকগুলি জিনিস ইমপ্রাই করলেন – বিরাট কোনও বক্তব্য নয় – একটা বিশেষ সময়কে চিহ্নিত করলেন – পোস্ট নাইনটিন্থ সেনচুরির একটা সময়ের বাংলা দেশের বা ভারতবর্ষের এক কনটেম্পটে, তখন ইউনিভার্সেলিটিটা একটু

সত্যজিৎ : পোস্ট নাইনটিন্থ সেনচুরি কী করে বলছেন জানি না – সাহেব সকলেই তো এইটিন্থ সেনচুরির

● মানে পোস্ট এইটিন্থ সেনচুরির

সত্যজিৎ : হ্যাঁ, এখন, আমার মনে হয়েছিল যে ভূত – আবার ঐ প্রশ্নটা আসে – গল্পে আছে ভূতেরা এসে নাচলো – সেটাকে যে কনক্রিটাইজ করতে হবে – এখন

ভূতেদের এ-রকম কনভেনশন আছে যে .... ভূতের কুলোর মতো কান, মুলোর মত দাঁত, কীসের মত পিঠ যেন আছে না? এখন সেটা আমার কাছে – সেটা খুব বেশিক্ষণ টানা যাবে বলে আমার মনে হয় নি। কেননা তাদের নাচের কোনও কনভেন্‌শন আছে বলে আমি জানি না। একরকম ভূতের নৃত্য হয় সেটা নিয়ে খুব একটা আর্টিস্টিক কিছু করা যাবে বলে আমার মনে হয় নি। তখন আমি ভূতটা নিয়ে অন্যরকমভাবে চিন্তা করতে আরম্ভ করলাম। আমি বললাম যে যারা মরেছে অ্যাকচুয়ালি, তাদের যদি ভূত হয় – অ্যাকচুয়ালি কতকগুলি ক্লাস অব পিপ্‌ল যারা অবভিয়াসলি বাংলা দেশে ছিল – রাজা-রাজড়া তো ছিলই একবারে বৌদ্ধ আমল থেকে এবং তারপর চাষাভুষোও ছিল – আর সাহেবরা তো প্রচুর আছে – বীরভূমে যেখানে আমরা শুটিং করেছিলাম তার মাইল দশেকের মধ্যেই কবরখানা এবং তারা বহু মরেছে অল্প বয়েসে আর কী – এবং আরেকটা জস্ট ফর এ ভিজুয়াল কন্ট্রাস্ট যদি একটা

না – একেবারে ইউনিক। শুধু পারকাশন নিয়ে গান ছাড়া এরকম কোয়ার্টেট আর নেই। তখন আমি ভাবলাম, এই চারটে শ্রেণীর ভূতকে এই চারটে যন্ত্রের সঙ্গে যদি আইডেন্টিফাই করা যায়। মৃদঙ্গ হল রাজার, যেহেতু মৃদঙ্গটা রিয়ালি ক্ল্যাসিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট। তাই নাচের ফর্মটা একেবারে ক্ল্যাসিক্যাল রাখা হল। খঞ্জিরা হল চাষাভুষোর – একেবারে চাষাভুষো এবং তাদের একটু সেমি-ফোক ধরনের করা হল। সাহেবদের জন্য ঘটম হল, একটু কটকটে আওয়াজ – একটু রিজিড আওয়াজ। সেইজন্য সাহেবদের অন্ডার-ক্র্যাঙ্ক করে তোলা হল, অর্থাৎ সিক্সটিন ফ্রেম্‌সে তোলা হল যাতে সমস্ত জিনিসটা একটু উডেন অ্যান্ড মেকানিক্যাল হয়ে যায়। আর মোটাদের জন্য ঐ মুড়শং রাখা হল যেটা একটা ফোক ইনস্ট্রুমেন্ট একেবারে। সে অদ্ভুত – লাস্ট যেটা মোটাদের ভূত –টোয়াং টোয়াং – এরকম ধরনের জিনিস – পারকাশন যন্ত্র – দাঁতে চিপে বাজায়। আচ্ছা, এই করে তারপর ঠিক হল, তাদের ফর্মটা কী হবে। তাদের

A) মৃদঙ্গ (রাজা)

মোটাদের দল করা যায়। সেখানে কারা-কারা থাকবেন? না, এ-রকম ওয়েলফেড পিপল – বানিয়া-টানিয়া, ফলারের বামুন-টামুন হল, কিছু পাদ্রি – এ-রকম নিয়ে একটা যদি গ্রুপ করা যায়। তখন চারটে ক্লাসে পরিণত হল জিনিসটা – একটা হচ্ছে রাজাদের, একটা হচ্ছে চাষাদের, একটা হচ্ছে সাহেবদের, একটা হচ্ছে মোটাদের মানে হৃষ্টপুষ্ট ব্যক্তিদের ভূত। চারটে যখন হল, তখন ইমিডিয়েটলি আমার একটা ক্ল্যাসিক্যাল মিউজিক্যাল ফর্মের কথা মনে হল যেটা আমি বার দুই শুনেছি এমনিতে – রেডিওতেও শুনেছি। চাক্ষুষ দেখেছি যখন দিল্লিতে ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল হয়, তখন ডেলিগেটদের জন্য একটা পারফরম্যান্স দিয়েছিল –কর্ণাটিক, সাউথ ইন্ডিয়ান পারকাশন ইনস্ট্রুমেন্ট 'চালবাদাকাচেরি' বলে একে – চার রকম পারকাশন – মৃদঙ্গ, ঘটম মানে হাঁড়ি, খঞ্জিরা আর মুড়শুং, মানে একটা ছোট যন্ত্র মেঁয়াও-মেঁয়াও করে বাজে। এই চারটে নিয়ে অসাধারণ একটা জিনিস ওরা করে, যেটা পৃথিবীর কোনও মিউজিকে আছে বলে আমার মনে হয়

ফর্মটা হচ্ছে ধীরে ঢিমে থেকে আরম্ভ করে চারটে যন্ত্রই সে ঢিমে লয়ে বাজল, আস্তে আস্তে তারপর মধ্য লয়ে বাজল – এই করতে করতে পাঁচটা মুভমেন্টে লয় বাড়িয়ে একেবারে জলদে পৌঁছে যাবে। তারপর ঠিক হল এই যে পাঁচটা মুভমেন্টের মধ্য দিয়ে এরা যাবে – এরা করবেটা কী? মানে মুভমেন্টটা বাড়ছে কেন? কেন লয়টা বাড়বে... তখন ঠিক হল যে এরা [ভূতেরা] আসুক, এরা নাচুক, এদের দ্বন্দ্ব লাগুক, পরে ভীষণ যুদ্ধ হয়ে মরে যাক। অটোমেটিক্যালি একটা ফ্রেনজিতে চলে যাচ্ছে জিনিসটা – এই গপ্পো তৈরি হয়ে গেল আমার। ফাইনালি আমার মনে হল একটা কোডা মত দরকার, যেটাতে দে মাস্ট অল বি ইন হারমনি উইথ ইচ আদার – কেননা ভূতেদের ইন্টারনাল দ্বন্দ্ব বলে তো কিছু থাকতে পারে না, একটা অবস্থা আসবে যখন, তখন মিলনটা সহজেই [ঘটবে], যেটা মানুষের মধ্যে কিছুতেই সহজে হচ্ছে না – সেটা ভূতেদের মধ্যে একটা গানের মধ্য দিয়ে হয়ে যাচ্ছে। এইভাবে পুরো জিনিসটা এমার্জ করল।

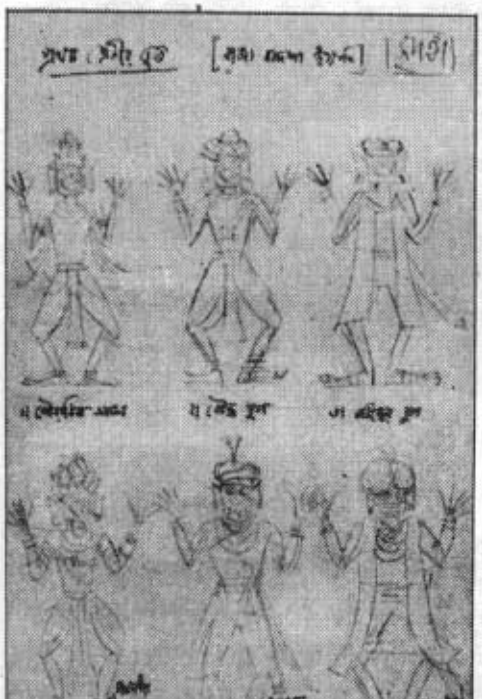

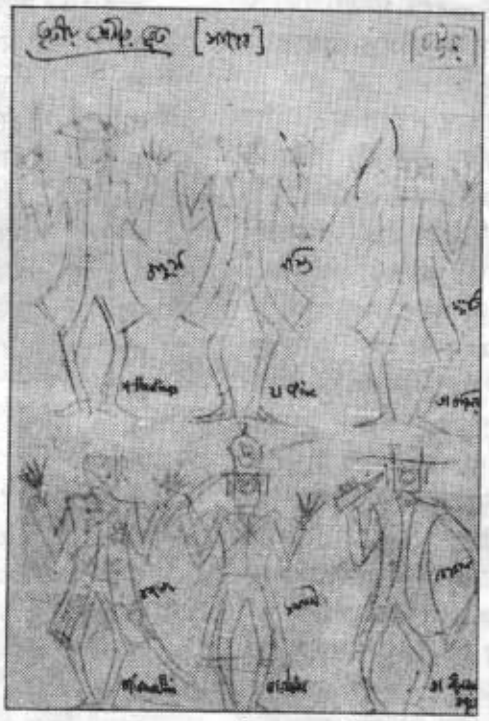

B) খঞ্জিরা (চাষা)

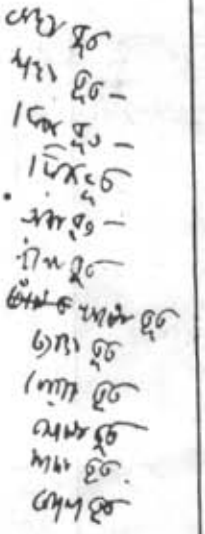

● এই সিকোয়েন্সটা [প্রসঙ্গে] আমাদের মনে হয়েছে যে ইউ হ্যাভ কভারড নিউ টেরিটরি... চারটে সারিতে ভূতেরা নাচছে...একদিকে সাদা-কালোর ব্যাপার – দ্বিতীয় দিকে চারটে সারিতে তারা নাচছে, তৃতীয় বলা যায় যখন জ্বলছে-নিবছে আলো... ভূতের রাজার চোখ দুটো এবং গলার শব্দ।

সত্যজিৎ : আমি নিজে বলতে পারি আমি কোনও ছবিতে কখনও নিজে এজিনিস দেখিনি। কমপ্লিটলি আমার নিজের মাথা থেকে বের করতে হয়েছে।... আমার একটা ভীষণভাবে, প্রচন্ডভাবে ইচ্ছে এবং চেষ্টা ছিল একটা নতুন কিছু করব – কেননা ভূতের ব্যাপারটা ওদের দেশে নেই। ভূত বলতে আমরা যে জিনিসটা বুঝি, ইন ফ্যাক্ট ঘোস্ট আর ভূত এক জিনিস নয় কিন্তু। স্পিরিট্স – কোনওটাই না।... [তার ওপর] ভূতের রাজা তো হয়ই না ওদের। কাজেই আই কুড নট ফল ব্যাক অন প্রিসিডেন্টস – কোনও মডেল বা কিছু [ছিল না] – মানে একেবারে নতুন জিনিস এবং তারপর যেমন-যেমন মাথায় এসেছে সেগুলি একজিকিউট করতে যা-যা টেকনিক্যাল ইনজেনুয়িটি দরকার সেটা খাটাতে হয়েছে। অনেক সময় প্রত্যেকটির কোনও প্রিসিডেন্ট নেই বলে ভেবে বার করতে হয়েছে – যেমন চার সারির ভূত – আমি কথার কথা বলছি – চার সারির ভূত যদি সত্যি করে মানুষকে সাজাতে হত, তাহলে আমার একটা তিনতলা বাড়ির সমান উঁচু শটের দরকার হত –যেরকম ফ্লোর এখানে নেই, ওদের দেশে হয়ত আছে। অর্থাৎ আমাকে করতে হয়েছে – একবার দু-সারির ফটোগ্রাফ নিতে হয়েছে – ওপরটাকে মাস্ক করে নিয়েছি। তারপর ক্যামেরার ফিল্মটাকে রিভার্স করে নিয়ে তলাটাকে মাস্ক করে আবার দু-সারির – ঐ একই পজিশনে ওরা দাঁড়িয়ে নাচছে, কিন্তু ঐ টপ হাফ অব দ্য ফ্রেম – ওদের অকুপাই করে আবার প্রিসাইজ মোমেন্ট ইন ইন দ্য মিউজিকে আবার জুম ব্যাক করে যেতে হয়েছে। দুবার –সেটা আমি নিজে গান-বাজনা করি, জানি, অনেকটা বুঝি বলে এবং নিজে ক্যামেরা অপারেট করি বলে। [সম্ভব হয়েছে]... একটা মিউজিকের একটা জায়গায় দেখবেন শটটা – প্রথমে ক্লোজ আপ যেতে আছে – তারপর বাঁই-বাঁই করে পিছিয়ে দেখা যায় যে চার সারির ভূত দাঁড়িয়ে আছে – এখন সেখানে মজা হচ্ছে যে আমি যখন পিছিয়ে এসেছি –দুবার, দুবারই তো পেছতে হয়েছে আমাকে – দুবারই ক্লোজ আপ থেকে আরম্ভ করতে হয়েছে আমাকে – দুবারই পিছতে হয়েছে। পিছনোটা পরে যখন সুপারইম্পোজ করেছি সেটা ঠিক অ্যাবসোলিউটলি কোয়েনসাইড না করলে একটা বিশ্রী কনফিউশন হত – একটা আগে পিছিয়ে যেত, একটা পরে পিছতো। এখন, সে মিউজিকের মাত্রা গুনে-গুনে একটা বিশেষ জায়গায় এসে জুমটাকে পৌঁছতে হয়েছে।

● হ্যান্ড-হেল্ড ক্যামেরা তো?

সত্যজিৎ : হ্যান্ড-হেল্ড নয়। ক্যামেরা ট্রেনে ছিল – তবে জুমটা তো হাতে অপারেট করে। জুম লেন্স-এর একটা রড থাকে। সেটা ঘোরাতে হয় আর কি! যাইহোক সেটা তো এভাবে হল।

● আর ভূতের রাজার যে বর দেওয়ার সিকোয়েন্সটা?

সত্যজিৎ : রাজার ব্যাপারটা অ্যাবসোলিউটলি স্ট্রেট – এক্সট্রিমলি সিম্পল ডিভাইস ইউজ করা হয়েছে – কিন্তু এতরকম সিমপ্রিসিটি আছে যে সব মিলিয়ে মনে হচ্ছে যে একটা দারুণ কমপ্লেক্স।... এক হচ্ছে ভূতের রাজার মুখের ওপর চকমক করছে অদ্ভুত আলোর মত – সেটা কিছুই নয়, সেটা চুমকি লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। লাগিয়ে একটা সফ্ট লাইট সামনে রাখা হয়েছিল। মুখটা নাড়লে ওগুলো চকমক করে, এবং ক্যামেরার লেন্সের সামনে একটা গজ দেওয়া হয়েছিল ডিফিউশন গোছের – যাতে চকমকিটা আরেকটু হাইটেন্ড হয়। তারপর দুটো দাঁত, দুটো শোলার টুকরো আর ভুরুটাকে একেবারে সাদা করে দেওয়া হয়েছিল। সর্বাঙ্গে কালো রঙ মাখানো হয়েছিল। তার ওপর মোটা সাদা পৈতে। ব্রহ্মদৈত্য আর কি!

● আচ্ছা ঐ ট্রিক শটগুলির কথা... যেরকম হাতে তালি দেবার সঙ্গে সঙ্গে ওরা চলে গেল – চোঁ করে একটা শব্দ হল।

সত্যজিৎ : শব্দ... আমি বলছি – প্রিসাইসলি কী কী এলিমেন্ট ওতে গেছে। যেই তালি দিল তক্ষুনি একটা শট –মোমেন্টারি একটা শট মাটি থেকে তড়াক করে আকাশের দিকে উড়ে যাচ্ছে। ছোট্ট একটা শট আছে। সেটা কিছুই নয় – একটা মাচা করা হয়েছিল – ক্যামেরাটা মাচার তলায় ছিল – ওরা ওপর থেকে নিচে লাফিয়ে পড়েছে।

● সেটা রিভার্সে করা হয়েছে?

সত্যজিৎ : হ্যাঁ। রিভার্স ক্যামেরায় তোলা হয়েছে। কাজেই দ্য বিগিনং অব দ্য এসেন্ট আপনি পাবেন – তারপর একটা অপটিক্যাল এফেক্ট আছে, যেটা কিছুই নয় – একটা ডার্ক স্টুডিও ফ্লোরের মধ্যে একটা লাইট রাখা হয়েছিল। একদিকে জুমটা এগিয়ে নিয়ে গেছি, পিছিয়ে নিয়ে গেছি। ঐ স্ট্রিপ অফ ফিল্মটা জুড়ে দেওয়া আছে। ফলে একটা এফেক্ট হচ্ছে যে আমি কোথায় চলে গেলাম, আবার কোথায় নেমে গেলাম। কিছুই না – একটা হোয়াইট স্পট ছোট্ট হয়ে গেল, তারপর বড় হয়ে গেল। আর আওয়াজটা তো উড়ন তুবড়ি [থেকে] পাওয়া যায় – আজকাল যে রকেট 'উশ' করে যায় – সেটা রেকর্ড করে নিয়ে একবার সোজা লাগানো হয়েছে, একবার সাউন্ডটাকে উল্টে লাগানো হয়েছে। আর... অবশ্য বরফ-টরফে কোনও ফাঁকি নেই। অ্যাকচুয়ালি ছ'ফুট ডিপ স্নো-তে গিয়ে তোলা হয়েছিল।

● কোথায় গিয়েছিলেন?

সত্যজিৎ : কুফরি – সিমলায়, যেখানে স্কীইং করতে যায়। তা সেই সেখানে তাদের (গুপী আর বাঘাকে) [নিয়ে যাওয়া হয়েছিল] নাইলনের মোজা পরিয়ে, কিন্তু জামা ছিল ঐ গ্রামের জামা – ভেতরে বোধহয় একটা গরম জামা পরে নিয়েছিল। এত স্পোর্টিং ছেলে দুটো না! তার মধ্যে লুটোপাটি গড়াগড়ি কত কী! ... তারপরেই ভুল করে দ্বিতীয় জায়গায় যেটা যাচ্ছে, সেটা হচ্ছে একটা রন্। রন্ কাকে বলে জানেন তো? সেই কচ্ছের রন্। জয়সলমির থেকেও পঁয়তাল্লিশ মাইল ইন্টেরিয়রে একেবারে টোটাল ফ্ল্যাট ডেজার্ট – টোটালি ফ্ল্যাট মানে ... স্যান্ডটা বসে গেছে। জমা স্যান্ড, ওগুলোকেই রন্ বলে। এখানে একটা প্রায় একশ আশি ডিগ্রি ব্যাপী মিরাজ ছিল – মরীচিকা। আমি এরকম মরীচিকা জীবনে দেখিনি। ঠিক মনে হচ্ছিল একটা, মানে একটা লিমিটলেস ওশেন পড়ে আছে। ... এবং ওখানে পালে পালে হরিণ জল খেতে গিয়ে মরে। আমি তো প্রথমে দেখে অবাক হয়ে

গেলাম – প্রথম যখন আগে একটা গাড়ি চলে গেল, আমি দেখছি দূর থেকে ওরা ওই হাঁটু জলে দাঁড়িয়ে রয়েছে – ইলিউশন হচ্ছে। যত কাছে যাচ্ছি, তত দেখছি জলটা রিসিড করে যাচ্ছে। তারপর গিয়ে দেখলাম, না, বালি। ফ্যানটাস্টিক। সেখানে ঐ সেকেন্ড ডিসেন্টটা – ভূতটা ... ঘুন্ডির যেটা হল। কাজেই দুটি করে শটের জন্য আমাকে একবার সিমলাতে যেতে হয়েছে –জাস্ট ফর টু শট্‌স দেয়ার। ...

● ক্যামেল স্রেটুন-এর কথা কিছু বলুন।

সত্যজিৎ : ক্যামেল স্রেটুন – তিনদিনের জন্য তিনশ ক্যামেল আমরা অ্যাফোর্ড করতে পেরেছিলাম। এবং তার মধ্যে আমাদের কাজ হত। ক্যামেলের দল আসত, দূর থেকে আসত। দশটা নাগাদ এসে পৌঁছাত। ঐ রোদে তো কাজ করা যায় না গরমে – টপ সান যাকে বলে, ভীষণ খারাপ। দুটোর থেকে ওরা রেডি হতে আরম্ভ করত, প্রত্যেকটি কস্টিউম – তিনশ লোকের অনেককে দাড়ি, সকলকেই পাগড়ি, জুতো এবং অস্ত্রশস্ত্র। এইসব করে ওরা রেডি হত অ্যাবাউট চারটে নাগাদ। চারটে থেকে সাড়ে ছ'টা পর্যন্ত আমরা তিনদিন শুটিং করেছি ... ফর দ্যাট এন্টায়ার ক্যামেল সিকোন্সে ইনক্লুডিং গুপীর ঐ গান। বুঝতে পারছেন –মানে, সে কী বলব – এরকম স্পিডি শুটিং কেউ কোনওদিন করেছেন কিনা জানি না। তবে উই হ্যাড দি অ্যাডভান্টেজ অফ থ্রি ক্যামেরাজ্‌ও। অবশ্য থ্রি ক্যামেরাজ্‌ও সবসময়ে চালাইনি। কেননা আমি তো শুধু একটাতেই থাকতে পারব। আমি কোনদিন ভরসা পাই না অন্যদের ক্যামেরায়, কী আসছে না আসছে আমি তো দেখতে পাচ্ছি না। সেজন্য মাত্র একটা সিনে একটা শটের জন্য তিনটে ক্যামেরা ব্যবহার করেছি। আদারওয়াইজ একটা ক্যামেরাতেই কাজ করেছি। এবং আমার যদি এক হাজার ক্যামেল [থাকত] একা সাতদিন সময় পেতাম অনেক ভাল হত ছবিটা। একটা রিয়েল, একটা ম্যাসিভ ফরওয়ার্ড মুভমেন্ট – এটা ভীষণ মিস করি আমি নিজে ...

● ডেনসিটি যেটা তিনশ ক্যামেলে আসতে পারে, হাজার ক্যামেলে কি তার চেয়ে বেশি আসতে পারে?

সত্যজিৎ : হ্যাঁ, ডাইমেনশনটা বেশি হলে ক্যামেরাটা আমি হাইটে তুলতে পারতাম। এখানে আমি সেটা অ্যাভয়েড করেছিলাম। কাছেই একটা উঁচু কনভিনিয়েন্ট পাহাড় ছিল। আমি ইচ্ছে করলে সেখানে ক্যামেরাটা রাখতে পারতাম, কিন্তু এ ভাস্ট ল্যান্ডস্কেপে তিনশ মানে কিছুই নয়। আমার মনে হয় হাজার ক্যামেল হলেও কিছু হত না; কিন্তু এর চেয়ে তবু বেশি হত। ... আমার যে এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে তাতে আমার মনে হয় দশ হাজার মত লোক হলে বেশ একটা ভাল ম্যাস দেখানো যেতে পারে। তবে এখানে আমার একটা ডায়ালগ – সেটা আমি লাস্ট মোমেন্টে কেন বাদ দিলাম জানি না। আমার ইচ্ছে ছিল, মন্ত্রীকে যখন সেনাপতি এসে বলছে, 'সৈন্যরা কথা শুনলে না', তখন যদি বলে দিত, 'আর কেউ আসেনি, মাত্র দুশ-তিনশ লোক। আর কেউ আসেইনি, তা যুদ্ধ করবে!' এটা বলে দিলেই হয়ে যেত। ওটা ওরিজিন্যাল ডায়ালগে ছিল না। পরে আমি অ্যাড করেছিলাম, কিন্তু অ্যাট দি টাইম অব শুটিং সামহাউ – এ শুটিংটা কলকাতায় হয়েছে – তখন আর এ জিনিসটা মাথায় নেই, মনে ছিল না।

● এই যে বলছিলেন যে তিনটে ক্যামেরা একসঙ্গে চালাতে পারতেন ইচ্ছে হলে – একসঙ্গে চালানো মানে কী?

সত্যজিৎ : একসঙ্গে চালানো মানে একটাতে লং শট নিচ্ছি, একটাতে ক্লোজ আপ নিচ্ছি, একটাতে মিড শট নিচ্ছি। ... 'শুন্ডী চলো' [বলে] আর্মি যেই মার্চ করতে আরম্ভ করল – তখন ন্যাচারালি নর্মাল মেথড অব শুটিং ইজ আমি ক্যামেলের ডিটেল দেখাচ্ছি, লং শট থেকে দেখাচ্ছি, পায়ের তলা থেকে দেখাচ্ছি। তার মানে কী? একটা ক্যামেরা থাকলে বারবার তো সেটা করতে হবে। আবার পিছিয়ে আনতে হবে। ...

সাক্ষাৎকার : ২

● ছবিটি যুদ্ধবিরোধী। শুনে মনে পড়ছিল কারেল জেমানের 'এ জেসটার্স টেল'-এর কথা। কিন্তু দেখে মনে হল দুটো ছবির স্বরলিপি ও স্বাদ আলাদা।

সত্যজিৎ : একই বক্তব্য আমি রাখতে চেয়েছি অন্যভাবে, আমার মত করে। ভাল রাজার দেশে সুখ শান্তি অথচ বিষাদ, খারাপ রাজার দেশে অত্যাচার, যুদ্ধোন্মাদনা – খাদ্যাভাব; অথচ রাজা-উজীরেরা প্রচুর খাচ্ছে, অযাচিত খাবার পেয়ে সৈন্যরা যুদ্ধ ভুলে যাচ্ছে; একই শিল্পীকে দিয়ে দুই রাজার ভূমিকাভিনয়; লড়াই-অনাচার-হিংস্রতার বিরুদ্ধে শিল্পের সংস্কৃতির অভিযান ও চূড়ান্ত জয় – এইভাবে আমি বক্তব্য রাখার চেষ্টা করেছি।

● চিত্রনাট্য এমনভাবে তৈরি, আপনি যেন ছবি দিয়ে গল্প বলে যাচ্ছেন রূপকথার ভঙ্গিতে। মাঝে-মাঝে জমে উঠছে নাটকীয় মুহূর্ত। শেষ পরিণতিটাও রূপকথার মত –রাজপুত্র পেল রাজকন্যাকে। কিন্তু –

সত্যজিৎ : বাঘার কনে যাচাইয়ের কথা বলছেন তো? রূপকথার রাজপুত্র ওভাবে যাচাই করে না। ওটা

আধুনিক কালের রীতি। আমি ইচ্ছে করেই দিয়েছি। লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন – ছবির আরম্ভে গুপীর কাহিনী হাজির হয়েছে বাস্তব রীতিতে। ভূতের নাচের পরেই ফ্যান্টাসির জগৎ –

● তারপর বাস্তব এসেছে ফ্যান্টাসিকে সঙ্গে জড়িয়ে মিশিয়ে –

সত্যজিৎ : হ্যাঁ, তাকেই টেনে নিয়ে গেছি শেষ দৃশ্য পর্যন্ত।

● এই যাচাই – সফিসটিকেশনের ব্যাপারটা দুবার দেখেও ধরতে পারিনি। ... আচ্ছা, চরিত্রও তো বদলে দিয়েছেন। বইয়ে বাঘা ভীতু, গুপী সাহসী; ছবিতে গুপী সরল, বাঘা চতুর।

সত্যজিৎ : গাইয়ে মানুষ একটু-আধটু সরল হয় না! তাছাড়া আর্টিস্টের কথা আমার মনে ছিল। দুজনের মিলিত অভিনয় একঘেয়ে হবে না, জমে উঠবে।

● বৈপরীত্যের এই খাত – রাজা দুজনের মধ্যেও। একজন সহজ সরল হাসিখুশি মিতবাক্; অন্যজন হিংসুটে কুচক্রী –এই তড়পাচ্ছে, এই মূর্ছা যাচ্ছে, পরক্ষণেই হাবাগোবা বাচ্চা খোকা।

সত্যজিৎ : দুটো দেশও দুজাতের। ভাল রাজার ঘরের রঙ সাদা, আয়তনে নিটোলতা, সোজা-সোজা পথ, স্বচ্ছ স্নিগ্ধ কারুকাজ। খারাপ রাজার ঘরে আলো কম, কালো বেশি, ভারি পাথর, প্যাঁচালো থাম, হরিণের সিং, মোষের মাথা, ভালুকের মুখ, বাঘের ছাল –

● সব মিলিয়ে জটিল, ভয়ঙ্কর হিংস্র। ভাল রাজার পোশাকে মেক আপেও আপনি দিয়েছেন শুচিশুভ্র পবিত্রতা, আর খারাপ রাজার ইউনিফর্ম, মিলিটারি বেল্ট, কালো ভারি পোশাক –

সত্যজিৎ : ওগুলো তৈরি আপহোলস্ট্রি মোটরের সিট ঢাকার কাপড় দিয়ে। ওটা একদিন হঠাৎ মনে হল।

● বাক্‌ভঙ্গিও তো অদ্ভুত – বোবাদেশের মানুষদের সুরেলা ভাবভঙ্গি, বদমাইশ রাজার চিৎকার, ভূতরাজার ছড়া, জাদুকরের ইশারা – প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা তারে বাঁধা; সব মিলিয়ে বৈচিত্র্যের আশ্চর্য মেলা!

সত্যজিৎ : ওটাও পরের। প্রথমে অন্যরকম ভেবেছিলাম। এখানে দেখতে পাবেন, আপনি যাকে বলেছেন বাস্তব ও ফ্যান্টাসির সমন্বয়।

● সেই পরিকল্পনাতেও বোধহয় এর শুরু রয়েছে।

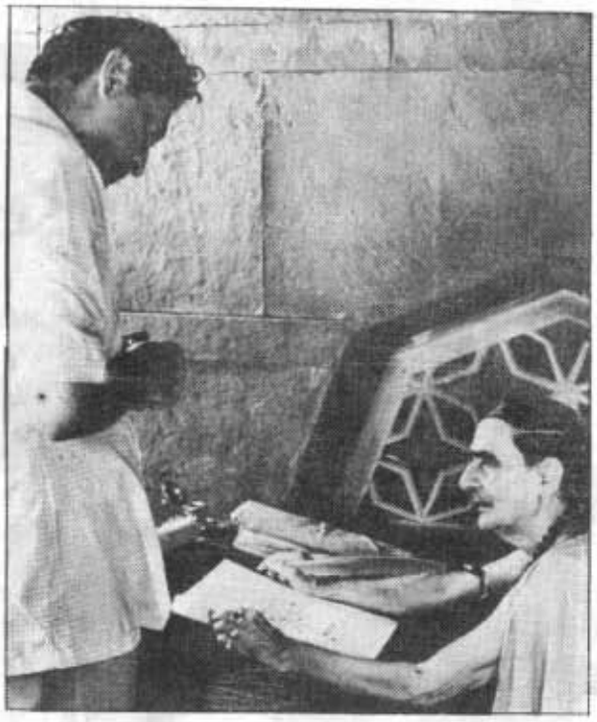

সত্যজিৎ : হ্যাঁ! শুটিং করেছি দুধরনের সেটে। একটা ইনডোরে তৈরি, এটা কল্পনা। আর আউটডোর শুটিং বীরভূম-যোধপুর-জয়সলমির-বুন্দি-কুফরি – এগুলো বাস্তব। কিন্তু যাঁরা দেখেননি এসব দেশ তাঁদের কাছে কল্পনা মনে হবে না কি?

● অর্থাৎ বাস্তবভিত্তিক কল্পনা!! যাঁরা দেখেছেন তাঁদের কাছেও অপরিচিত মনে হবে – ক্যামেরা এমনভাবে তুলেছে দৃশ্যগুলো। – একটা কথা – ইনডোর সেটের স্থাপত্য দেখে তো কোনও দেশের মনে হয় না, আবার কোনও অরূপ জগতের ডিসটর্টেড অলঙ্করণও নয়।

সত্যজিৎ : ঠিকই বলেছেন, আমি কোনও বিশেষ স্কুল বা রীতি অনুসরণ করিনি। রাজস্থানী, মোগলাই, পারসিক, চৈনিক, ইওরোপিয় – নানান শিল্প থেকে উপকরণ ও কৌশল নিয়ে, তাদের মিলিয়ে-মিশিয়ে ফ্যান্টাসির জগৎ তৈরি করতে চেয়েছি।

● সাজ-পোশাকের মধ্যেও তার পরিচয় আছে।

সত্যজিৎ : চার বামনের মধ্যেও। ভারতীয় রূপকথায় ওরা থাকে না। তাছাড়া সায়েন্স ফিকশনের প্রভাবও আছে।

● ভূতরাজার ইলেক্‌ট্রিক চালচিত্র? আর সেই তালে ছড়া কাটা?

সত্যজিৎ : অন্যত্রও আছে।

● জাদুকরের মেক আপটা সবচেয়ে মজার। আচ্ছা, ওর মাথায় ঐ যে শিংয়ের মত – লম্বা দুটো শিং, শেষপ্রান্তে বল –

সত্যজিৎ : ওটা নিয়েছি পিকিং অপেরা থেকে। মাথা নাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিং দুলতে থাকে, আমার অদ্ভুত লেগেছিল।

● ছবিতে অজস্র ট্রিক শট এবং ল্যাবরেটরির কারুকাজ আছে। ফ্যান্টাসির পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। আমাকে অবাক করেছে ক্যামেরার ব্যবহার, যেন সে যুগের সন্দেশের পাতায় পাতায় ছবি। আপনার ক্যামেরা ব্যবহারের একটা বিশিষ্ট স্টাইল বা ঘরানা আছে, কিন্তু এছবিতে সে ঘরানা ভেঙে ফেলে ক্যামেরা যে কী করেছে আর কী যে করেনি –

সত্যজিৎ : ফ্যান্টাসির প্রয়োজনে। শব্দ নিয়েও এক্সপেরিমেন্ট আছে।

● আমার মনে পড়ছে ভূত রাজার ছড়া বলার কর্কশ ভঙ্গিটা শুনেছি –

সত্যজিৎ : হ্যাঁ, ওটা আমারই কণ্ঠস্বর একটা স্পিডে টেপে তুলেছি, তারপর স্পিড বাড়িয়ে ...

● আর ঐ যে ভূতদের মুখ বেঁকে যাচ্ছে, গলে যাচ্ছে, ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে –

সত্যজিৎ : ওটা বোম্বের একটি ছেলেকে দিয়ে ল্যাবরেটরিতে করিয়েছি।

● উপেন্দ্রকিশোরের ভূত ছিল রূপকথার জীব : চোখগুলো জ্বলছে, যেন আগুনের ভাঁটা, দাঁতগুলো বেরুছে যেন মুলোর সার। কিন্তু আপনার ছবিতে –

সত্যজিৎ : বদলে দিয়েছি। চেনা ভূত এনে লাভ কি? বাস্তবকে আনা যাক না! ভেবে ভেবে চার জাতের ভূত তৈরি করলাম – রাজা-ভূত, প্রজা-ভূত, বেনে-ভূত আর সাহেব-ভূত। এদের দিয়ে একটি ছোটখাট নাটকও তোলা হয়েছে। ...

গুগাবাবা মিউজিয়ম

দেবাশিস মুখোপাধ্যায়

গুপী

আসল নাম গুপী কাইন। নিবাস আমলকি গ্রাম। তার বাবা কানু কাইনের ছিল মুদীর দোকান। গ্রামে গুপী একাই গাইতে পারত গান। তবে গান জানা ছিল একটাই। গুপী নিজেকে বলত গোপীনাথ ওস্তাদ। গ্রামের লোক খাতির করে বলত গুপী 'গাইন'। স্ত্রী, শুণ্ডীর রাজকন্যা মণিমালা। পুত্র এক। রাজা বনবাসে যাওয়ায় বর্তমানে শুণ্ডীর রাজা। বয়স ৪০।

বাঘা

বাঘা-র নিবাস গ্রাম হরতুকি। বাবার নাম পাঁচু পাইন। আসলে পাঁচুর ছেলের শখ ঢোলক বাজানোর। বাজাতে বাজাতে সে খেঁকিয়ে উঠত বাঘের মত। তাই লোকে তার নাম রেখেছিল 'বাঘা' পাইন। বাঘা নিজে বলত বাঘা বাইন। বাঘার আসল নাম কেউ জানে না। শুণ্ডী রাজার যমজ ভাই হাল্লার রাজা। হাল্লা রাজকন্যা মুক্তামালা-কে বিয়ে করেছে বাঘা। এক পুত্র। বর্তমানে গুপী-বাঘা দুজনেই শুণ্ডী রাজা। বয়স ৪০-এর একটু বেশি।

গুপী-বাঘা রাজা- মন্ত্রী

১৯৬২-তে অভিযান-এর সময় থেকেই সত্যজিতের মাথায় গুপী-বাঘার ভাবনা। তখন ঠিক ছিল গুপী হবে কাঞ্চনজঙ্ঘা-র অরুণ মুখোপাধ্যায়। বাঘা রবি ঘোষ। নানা কারণে ছবিটি পিছিয়ে যায় পাঁচ বছর। ঠিক হয় গুপীর চরিত্রে অভিনয় করবেন কিশোরকুমার। গুপীর

গানগুলোও গাইবেন তিনি। 'ডেট' নিয়ে গণ্ডগোল! কিশোর গেলেন, এলেন জীবনলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। যিনি পরে সত্যযুগ-এর সম্পাদক। এক সময় 'গুগাবাবা'-র প্রযোজনা করতে এগিয়ে এসেছিলেন বোম্বের রাজ কাপুর।- তবে শর্ত একটাই, ছবিতে গুপী হবে পৃথ্বীরাজ কাপুর, বাঘা শশী কাপুর। মুহূর্তে প্রস্তাব বাতিল। অবশেষে 'ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস'-এর বিজ্ঞাপন বিভাগের কর্মচারী তপেন চট্টোপাধ্যায়। বাঘা গোড়া থেকেই ঠিক রবি ঘোষ। হাল্লা ও শুণ্ডী রাজার চরিত্রে প্রথমে ভাবা হয়েছিল ছবি বিশ্বাসকে। হাল্লা মন্ত্রী তুলসী চক্রবর্তী। পরে দুজনেই মারা যাওয়ায় নির্বাচিত হয়েছিলেন সন্তোষ দত্ত ও জহর রায়।

শুটিং পর্ব

গুপী গাইন বাঘা বাইন।। ১৯৬৮-র জানুয়ারি থেকে শুটিং শুরু। ডিসেম্বরে ছবির কাজ শেষ। খরচ পড়েছিল চার লাখ। প্রযোজক নেপাল দত্ত ও অসীম দত্ত।

হীরক রাজার দেশে।। প্রযোজনা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের। বাজেট ১৫ লাখ। ছবির নাম প্রথমে ঠিক হয়েছিল 'গুপী বাঘা রাজার জামাই'। পরে বদলে যায়। ১৯৭৯ সালের জুন মাসে শুটিং শুরু। শেষ হয় ১৯৮০-র এপ্রিলে।

গুপী বাঘা ফিরে এলো।। ১৯৮৯-এর ১৪ জুন সংগীত গ্রহণ করে শুরু হয় ছবির কাজ। ২৫ জুলাই থেকে মাত্র ৪৫ দিনে ইনডোরের কাজ শেষ। আউটডোরের কাজ শেষ হয়েছিল মার্চ, ১৯৯০-এ। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রযোজনায় ছবিটির আনুমানিক ব্যয় ৩০ লক্ষ।

আউটডোর

গুপী গাইন বাঘা বাইন।। বীরভূমের বাগমুন্ডি আর নতুন গাঁ, সিমলার কাছে কুফরি, জয়শলমীর থেকে মাইল কুড়ি দূরের মোহনগড়, বুঁদি।

হীরক রাজার দেশে।। পুরুলিয়ার মিশিরডি গ্রাম ও জয়চণ্ডী পাহাড়, কাঠমান্ডু, শিলিগুড়ির জঙ্গল, মহাবলীপুরম আর জয়পুর।

গুপী বাঘা ফিরে এলো।। বর্ধমানের কাছে মেমারির বাঁশবন। ওড়িশায় ব্রাহ্মণী নদীর তীর, ঢেনকানলের জঙ্গল আর তোষালি স্যান্ডস। শান্তিনিকেতন, দুবরাজপুর, বনেরপুকুর। রাজস্থানের উদয়পুর, কায়া কুম্ভলগড় দুর্গ। হিমাচল-প্রদেশে নারগান্ডা-য়।

মুক্তি

গুপী গাইন বাঘা বাইন।। ৮ মে ১৯৬৯। চলেছিল একটানা ১০২ সপ্তাহ। বাংলা চলচ্চিত্র ইতিহাসে এই রেকর্ড আজও অম্লান।

হীরক রাজার দেশে

হীরক রাজার দেশে।। ১৯ ডিসেম্বর ১৯৮০। ৪২ সপ্তাহ চলার পর ছবিটি তুলে নেওয়া হয়েছিল।

গুপী বাঘা ফিরে এলো।। ৩ জানুয়ারি ১৯৯২। ৩৯ সপ্তাহের পর নন্দন-এ ছবিটি ১৬ দিন দেখানো হয়। কলকাতার বাইরে এখনও চলছে।

রেকর্ড- ক্যাসেট

গুপী গাইন বাঘা বাইন ছবির তিনটি 'ফরটি ফাইভ-স্ট্যান্ডার্ড প্লে', একটি 'ফরটি ফাইভ-এক্সটেন্ডেড প্লে' ও একটি 'লঙ প্লে' রেকর্ড প্রকাশিত হয়।

হীরক রাজার দেশে'-র একটি 'ফরটি ফাইভ এক্সটেন্ডেড প্লে' ও একটি 'লঙ প্লে' এবং 'গুপী বাঘা ফিরে এলো'-র একটি 'লঙ প্লে' রেকর্ড প্রকাশিত। ক্যাসেট বেরিয়েছে 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' ও 'হীরক রাজার দেশে' একসঙ্গে। আলাদা করে 'গুপী বাঘা ফিরে এলো'-র।

পুরস্কার

গুপী গাইন বাঘা বাইন

১। ভারত: রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক (শ্রেষ্ঠ ছবি), শ্রেষ্ঠ পরিচালক ১৯৬৯

২। অ্যাডিলেড: শ্রেষ্ঠ পরিচালকের জন্যে সিলভার সাদার্ন ক্রশ ১৯৬৯

৩। অকল্যান্ড: শ্রেষ্ঠ ছবি, শ্রেষ্ঠ পরিচালক ১৯৬৯

৪। টোকিও: 'মেরিট' পুরস্কার ১৯৭০

৫। মেলবোর্ন: শ্রেষ্ঠ ছবি ১৯৭০

১৯৬৯-এ বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবে প্রতিযোগিতা বিভাগের উদ্বোধন হয় এই ছবিটি দেখিয়ে।

হীরক রাজার দেশে

১। ভারত: শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত পরিচালক, শ্রেষ্ঠ গীত রচনা ১৯৮০

২। সাইপ্রাস: বিশেষ পুরস্কার ১৯৭৯

১৯৮০ সালে লন্ডন চলচ্চিত্র উৎসবে ছবিটি দেখানো হয়। মুক্তি পেয়েছিল সোবিয়েত রাশিয়ায়, রুশ ভাষায় 'ডাব' করে। ১৯৮১-তে বাংলাদেশ টিভি-তে দেখানো হলে গোটা দেশে ছবিটির প্রভাব পড়ে।

গুপী বাঘা ফিরে এলো

১৯৯০-এ লন্ডন চলচ্চিত্র উৎসবে শিশু বিভাগে ছবিটি দেখানো হয়। নির্বাচিত হয়েছিল বাঙ্গালোর ফিল্মোৎসবে (১৯৯২) 'ইন্ডিয়ান প্যানোরামা'য়। পরিচালক সন্দীপ রায় এশিয়ান পেন্টস ১০ম শিরোমণি পুরস্কার পেয়েছেন।

আরও এক

১। সত্যজিতের ভাবনায় হাল্লার সেনারা আসলে ঘোড়-সওয়ার। অনেক খুঁজেও অতগুলো ঘোড়া না পাওয়ায় হাল্লা রাজার সেনা উষ্ট্রবাহিনী হয়ে যায়।

২। উদয়ন পন্ডিতের গ্রেপ্তার করার দৃশ্যটির শুটিং হয়েছিল পুরুলিয়ায়। সেই রাত্রি-দৃশ্যটি তোলা হয়েছিল শুধু মশাল আর বড় রঙ মশালের আলোয়।

৩। প্রথম ছবিতে চিত্রনাট্য, সাজসজ্জা, গীতরচনা, আবহসঙ্গীত ও পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন সত্যজিৎ রায়। 'হীরক রাজার দেশে' তালিকায় যোগ হয় কাহিনী। 'গুগাবাবা'-তে সন্দীপের নাম ছিল কৃতজ্ঞতা স্বীকারের তালিকায়। পরেরটিতে সহকারী পরিচালক 'গুপী বাঘা ফিরে এলো'-তে সত্যজিতের ভূমিকা কাহিনী, গীত রচনা ও সঙ্গীত পরিচালনার। চিত্রনাট্য ও পরিচালনা সন্দীপ রায়ের।

৪। 'হীরক রাজার দেশে' একটা দৃশ্যে ছিল উদয়ন পন্ডিত বাঁদিকে ঘুরে হীরক রাজার কেল্লাটা দেখছে। উদয়ন পন্ডিতের দৃশ্যটা তোলা হয়েছিল পুরুলিয়ায় আর কেল্লাটা জয়পুরে। এভাবে তিন হাজার মাইল দূরের দুটো লোকেশনকে জুড়ে দেওয়া বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে প্রথম।

৫। 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' গল্পে ছিল গুপী চালাক, বাঘা একটু সাধাসিধে। হাল্লা রাজা ভাল, শুন্ডী দুষ্টু। ছবিতে দুটোই উল্টো। গুপী বোকা-সোকা, বাঘা বোকাদার। ভাল শুন্ডী, হাল্লা খারাপ।

৬। 'গুপী গাইন বাঘা বাইন'-এ ভূতের রাজার গলাটি ছিল পরিচালক স্বয়ং সত্যজিৎ রায়ের। একটা স্পিডে টেপে তুলে, তারপর স্পিড বাড়িয়ে রেকর্ড করেছিলেন। পরের ছবিতে যন্তরমন্তর ঘরের সেই মস্তিষ্ক প্রক্ষালন যন্ত্রের অমানুষিক কণ্ঠস্বরটিও সত্যজিতের। এবারে স্পিড কমিয়ে রেকর্ডিং। তিন নম্বর ছবিতে ভূতের রাজার কণ্ঠস্বর নিয়ম মেনে পরিচালকেরই। পরিচালক সন্দীপ রায়ের।

৭। এডিটিং টেবিলে বসে 'হীরক রাজার দেশে'র শেষ গানটির দৃশ্য সত্যজিতের পছন্দ হয়নি। শেষ গানের গোটা দৃশ্যটা আবার নতুন করে তুলে এনেছিলেন। সত্যজিতের কোন ছবির ক্ষেত্রেই আগে বা পরে এমন কখনও ঘটেনি।

৮। গুগা বাবা রাজভোগ। সত্তরের দশকে কলকাতায় সাড়া ফেলেছিল এই অতিকায় মিষ্টি। 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' রিলিজ করার পরই মিষ্টির দোকানে দোকানে শোকেস আলো করে ছিল এই রাজভোগ। দাম ছিল ১ টাকা।

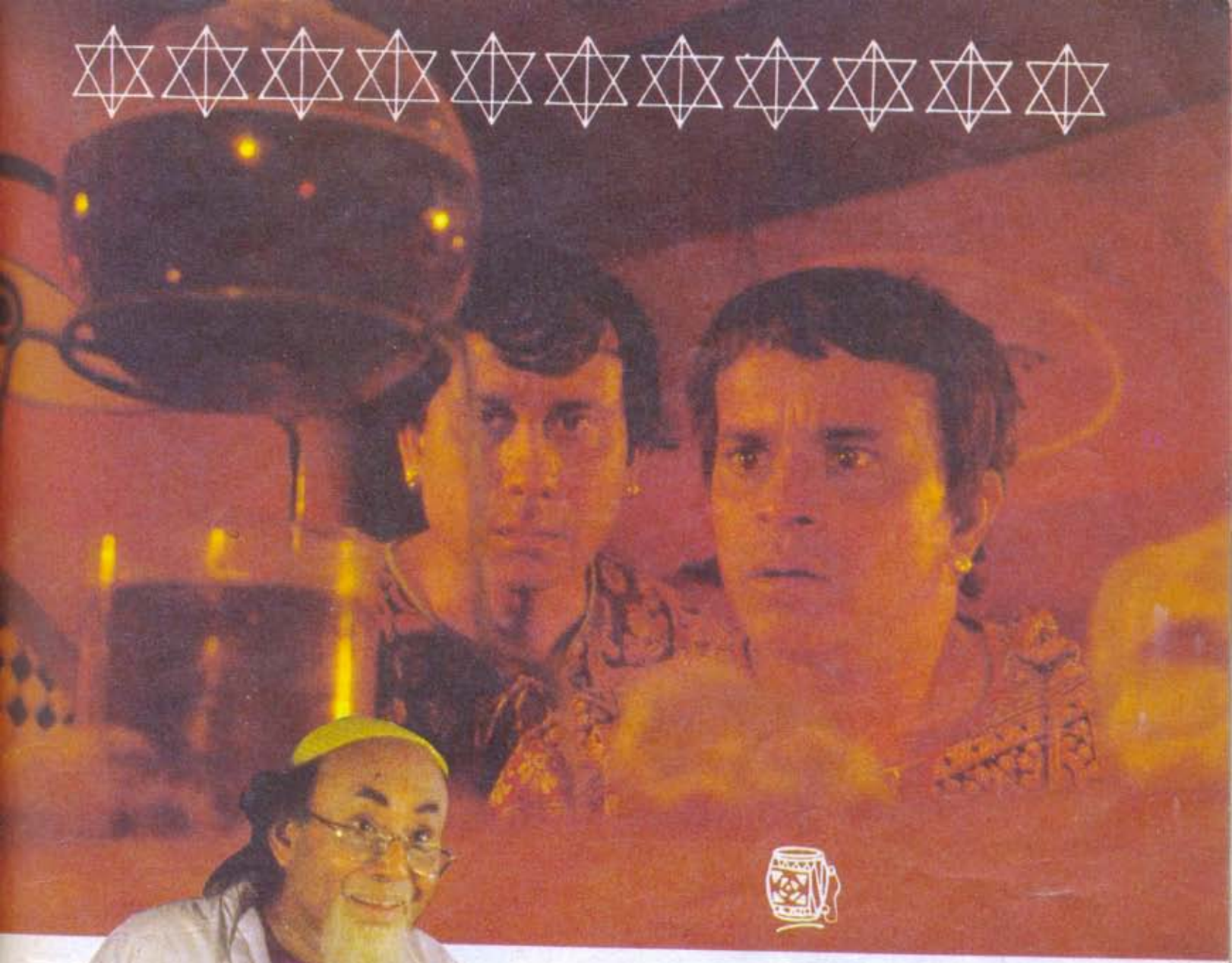

যন্তরমন্তর

যে করে খনিতে শ্রম
জেনো তারে ডরে যম।

ভরপেট নাও খাই
রাজকর দেওয়া চাই।

জানার কোন শেষ নাই
জানার চেষ্টা বৃথা তাই।

এইসব মারাত্মক ছড়া শেখাত কে? মস্তিষ্ক প্রক্ষালন যন্ত্র কার তৈরি? হীরক রাজার দেশের বৈজ্ঞানিকের ভয়ংকর ল্যাবরেটরির

কথা মনে পড়ছে তো। হীরক রাজা অনেক
হীরে দিয়ে পুষেছিল বৈজ্ঞানিককে। সে
বানিয়েছিল এমন এক কল, যা দিয়ে রাজকার্য
হয়ে যাবে জল।
এর সাহায্যে
রাজভক্তি প্রকাশে নারাজ যে
তারে করে তোলা রাজভক্ত
মোটে নয় শক্ত।

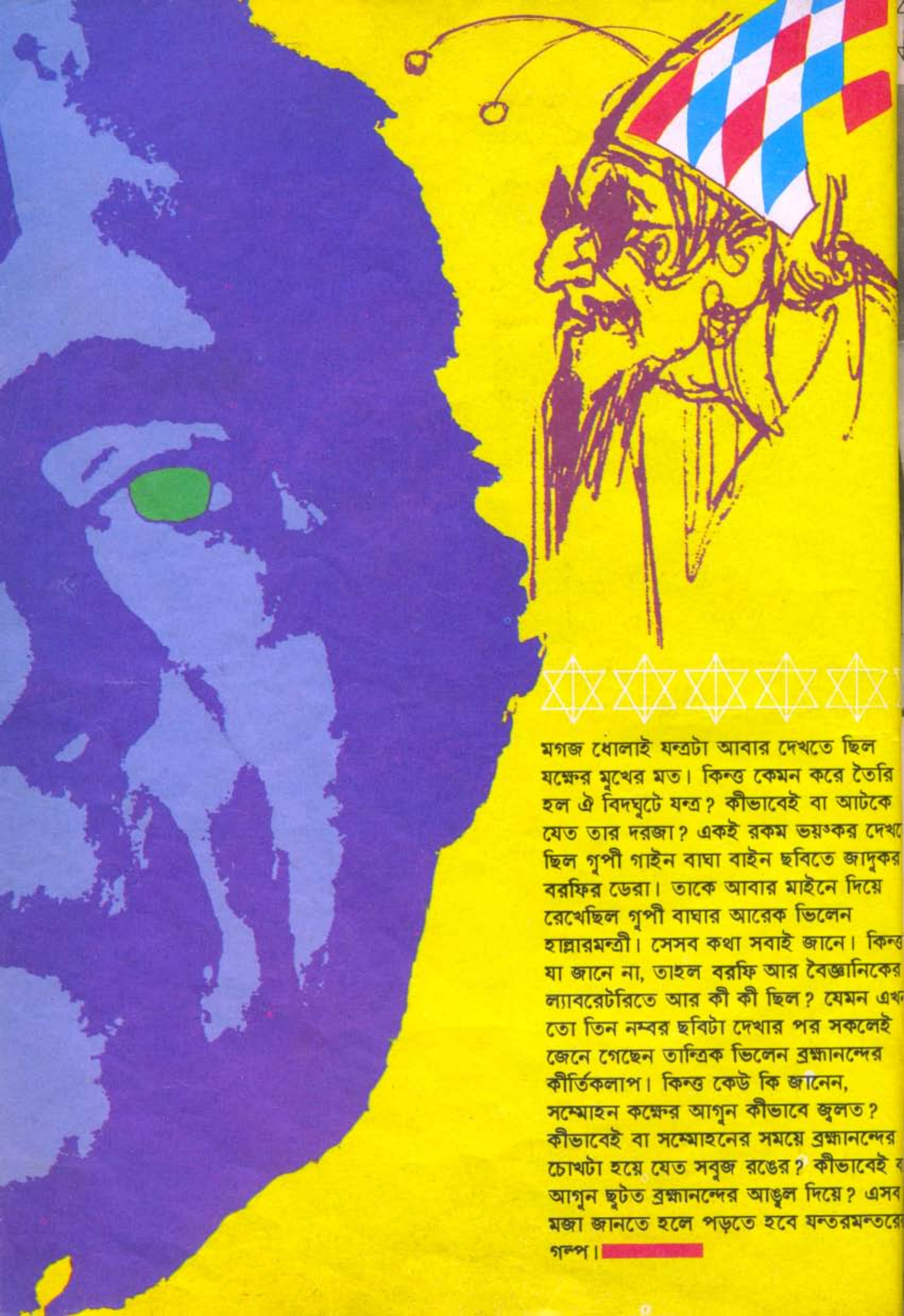

মগজ ধোলাই যন্ত্রটা আবার দেখতে ছিল যক্ষের মুখের মত। কিন্তু কেমন করে তৈরি হল ঐ বিদঘুটে যন্ত্র? কীভাবেই বা আটকে যেত তার দরজা? একই রকম ভয়ংকর দেখ ছিল গুপী গাইন বাঘা বাইন ছবিতে জাদুকর বরফির ডেরা। তাকে আবার মাইনে দিয়ে রেখেছিল গুপী বাঘার আরেক ভিলেন হাল্লারমন্ত্রী। সেসব কথা সবাই জানে। কিন্ত যা জানে না, তাহল বরফি আর বৈজ্ঞানিকের ল্যাবরেটরিতে আর কী কী ছিল? যেমন এখ তো তিন নম্বর ছবিটা দেখার পর সকলেই জেনে গেছেন তান্ত্রিক ভিলেন ব্রহ্মানন্দের কীর্তিকলাপ। কিন্তু কেউ কি জানেন, সম্মোহন কক্ষের আগুন কীভাবে জ্বলত? কীভাবেই বা সম্মোহনের সময়ে ব্রহ্মানন্দের চোখটা হয়ে যেত সবুজ রঙের? কীভাবেই আগুন ছুটত ব্রহ্মানন্দের আঙুল দিয়ে? এসব মজা জানতে হলে পড়তে হবে যন্তরমন্তরে গল্প।

গুপী বাঘার তিনটি ছবিতে আছে তিন জবরদস্ত ভিলেন। 'গুপী বাঘা ফিরে এলো'র তান্ত্রিক ব্রহ্মানন্দ পাকাপাকি ভিলেন বটে, কিন্তু এক নম্বর আর দুনম্বর ছবিতে বরফি আর বৈজ্ঞানিক কিন্তু পুরোপুরি ভিলেন নয়। একজন ভিলেন হাল্লার মন্ত্রীমশাইয়ের সহযোগী, অন্যজন ভিলেন হীরক রাজার মাইনে করা লোক। দুজনেই জ্ঞানীগুণী, প্রভূত ক্ষমতাসম্পন্ন, ব্রহ্মানন্দের মতই। কিন্তু প্রথম দুজন সরাসরি গুপী বাঘার বিরুদ্ধে নয়। যে ওদের পয়সাকড়ি দেয় ওরা তাদের হয়েই কাজ করে। বৈজ্ঞানিককে তো আবার 'রাজার লোক' বলায় চটে আগুন হয়ে গিয়েছিল। আমি 'একক' বলে লাফালাফিও করে। তবে বরফি, বৈজ্ঞানিক আর ব্রহ্মানন্দের প্রচুর মিল। প্রথম মিল তিনজনেরই নামে শুরু 'বর' অক্ষরটি দিয়ে। আর দ্বিতীয় মিল তিনজনেই বেজায় লোভী। বৈজ্ঞানিক তো গুপীবাঘার কাছে হীরে ঘুষ পাওয়ার পরেই গুপীবাঘার হয়ে কাজ শুরু করে দিল। এমনকি ওদের তৈরি 'দড়ি ধরে মার টান, রাজা হবে খান খান' মন্ত্রটা পর্যন্ত মেশিনে ঢুকিয়ে দিল। ওদের তিননম্বর মিল, তিনজনেরই একটা করে গবেষণাগার আছে। ওদের কাজকর্মের ঘর আর কি। তিনজনেরই মেকআপ আর পোশাক অদ্ভুত একেবারে নতুন ধরনের। পোশাকের মধ্যেও একটা মিল অবশ্যই আছে। একটু খুঁটিয়ে দেখলেই মিলটা বোঝা যাবে। আসুন দেখা যাক, কীভাবে এই তিনজনকে তৈরি করা হল।

□

সত্যজিৎ রায় যখন বরফির পোশাকের ডিজাইন করেন তখন ভাবা ছিল চাইনিজ অপেরার অভিনেতাদের পোশাক। মাথার

গল্প বলেছেন ঃ অশোক বসু, অনন্ত দাশ

টুপিটা ছিল ডোরাকাটা আর লম্বাটে। যেন মাথার পেছনে একটু ল্যাতপ্যাত করে। গায়ের জোব্বাটাও সেইভাবে তৈরি ছিল। অনেকটা বেশি কাপড় দিয়ে। চোখে চারকোণা কালো কাচের চশমা পরানোর ব্যাপারটা সত্যজিতের আঁকা প্রথম স্কেচেই ছিল। আর ছিল থুতনিতে ছাগুলে দাড়ি। মেফিস্টোফিলিস বা শয়তানেরও নাকি অমন ছাগুলে দাড়িই ছিল। কিন্তু শুটিং শুরু হওয়ার আগে হরীন্দ্রনাথকে কস্ট্যুম পরাবার পরেও মন ভরল না সত্যজিতের। কোথায় যেন একটু একটু ন্যাড়ান্যাড়া লাগছে। হাতে জাদুদন্ড তুলে দেওয়ার পরেও চেহারাটা যেন সেরকম জমছে না। সত্যজিৎ আবার খাতা পেনসিল নিয়ে বসলেন। আর তারপরেই বেরিয়ে এল টুপির মাথা থেকে সেই আশ্চর্য অ্যান্টেনা। তখন তো আর এদেশে টিভি ছিল না। কতকটা ঐরকম দেখতে ছিল রেডিওর এরিয়েল। সত্যজিৎ অবশ্য ভেবেছিলেন একেবারে চাইনিজ অপেরার ফর্মেই। স্প্রিং-এর ডগায় পিং পং বল বসনো জিনিসপত্র ওদের সঙ্গে প্রায়ই থাকত। বরফির টুপির মাথাটা একটু কেটে দিয়ে দুপাশে দুটো তার লাগিয়ে ডগায় বলদুটো বসিয়ে দেওয়া হল। বরফি হাঁটছে, চলছে, বসছে, মাথা দোলাচ্ছে – আর ঐ তারের মাথায় বলদুটো টুকটুক করে নড়ছে। চেহারাটা দেখে ইউনিটের সকলে আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল। লম্বাটে টুপি ছিল তাই আগে টুপির রঙ ছিল ডোরাকাটা। এখন চেহারাটা পালটে যেতে ডোরার বদলে চলে এল নানা রঙের চৌখুপ্পি। ঐরকম রঙিন চৌখুপ্পি আবার নেমে এল পরপর বরফির জোব্বার উপর থেকে নিচে পর্যন্ত। তৈরি হয়ে গেল বরফি দি গ্রেট।

□

মাত্র তিনদিন জাদুর মেয়াদ ছিল বরফির। ঐ অল্প সময়েও তার কান্ডকারখানা প্রচুর। শূন্য থেকে চেয়ার এনেছে, চেয়ার ভেঙে পড়ায় কিউব এনেছে। ভালমানুষ রাজাকে ওষুধ খাইয়ে যুদ্ধোন্মাদ করেছে, জাদুদন্ড নাড়িয়ে স্থির লোকজনকে হাঁটাচলা করিয়েছে। মিনিটের মধ্যে নিজের চেহারা বারবার পালটেছে, বোবাকে কথা বলানোর ওষুধ তৈরি করেছে। এর জন্য ক্যামেরার বেশ কিছু স্পেশাল এফেক্ট আর মেকআপের কায়দা দরকার ছিল। স্পেশাল এফেক্টের মেশিনপত্র এদেশে তখন বিশেষ ছিল না। কাজেই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ফিল্ম কেটে স্ট্যাকাটো এফেক্ট আনতে হয়েছে। হাল্লার রাজার দাড়ি কুঁচকে যাওয়ার সময়েও ঐভাবে ফিল্মের কয়েকটা করে গেট কেটে নেওয়া হয়েছিল। তখন সেট ডিজাইনার বংশী চন্দ্রগুপ্ত। বরফির ডেরাটা মনে আছে তো। সেই যে হাল্লার মন্ত্রী ঢুকল মাথা নিচু করে সুড়ঙ্গের মধ্যে দিয়ে। গোটা সেটটা তৈরি হয়েছিল প্লাস্টার অফ প্যারিস দিয়ে। তখনকার দিনে কাঠ আর কাপড় দিয়েই সেট তৈরি হত। প্লাস্টার অফ প্যারিসের রেওয়াজ সত্যজিৎ আর বংশী চন্দ্রগুপ্ত থেকেই। প্লাস্টার অফ প্যারিস দিয়ে সেটটা তৈরির পরে পুরনো আর নোংরা এফেক্টটা আনতে ঘষে দেওয়া হল বালি। খাঁচার মধ্যে বসিয়ে দেওয়া হল, বাঁদর, কাঠবিড়ালী আর প্যাঁচা। বরফির ঠিক মুখের সামনে বসানো ছিল একটা বিদঘুটে হাঁড়ি আর মোমবাতি। সবমিলিয়ে লক্ষ্য রাখা হয়েছিল, যাতে জাদুকর বরফির গবেষণাগারটিও হয় বরফির মত অদ্ভুত, ভোজবাজিতে ভরা। আর হ্যাঁ, ভাল কথা বরফির এই আশ্চর্য ডেরাটা তৈরি হয়েছিল কলকাতাতেই, নিউ থিয়েটার্স এক নম্বর স্টুডিওতে।

বৈজ্ঞানিক কেমন, তার একটা আগাম পরিচয় হীরক রাজা দিয়ে রেখেছিল, 'জম্বুদ্বীপ থেকে এসে, আজ সাতমাস অন্নধ্বংস করছে সে। বলে আমি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী, বিজ্ঞানের হেন কিছু নাই, যা না জানি। দিনরাত্র না জানি কী করে তার যন্তরমন্তর ঘরে। সোনা রূপা তামা শিশা লোহা সাপ ব্যাঙ, শকুনির ঠ্যাঙ – কী নাই সে ঘরে। সাড়ে সাত লক্ষ মুদ্রা নিয়েছে আগাম, অথচ কাজের নাই নাম।' এমন এক বৈজ্ঞানিক, যার পরনে সাদা ল্যাবরেটরি অ্যাপ্রন, নীল প্যান্ট, মাথায় হলদে বেঁটে টুপি, নাকের ডগায় রিমলেস চশমা আর গলায় চাবির মালা। প্রথম দৃশ্যে রাজদরবারে যখন সে ঢোকে, তখন ওভারলের নিচের দিকে রঙের দাগ। আর্টিস্ট যেন, ছবি আঁকতে আঁকতে উঠে এসেছে। প্রথমে রঙের দাগটা ছিল না। সত্যজিৎ অনন্ত দাশকে মনে করিয়ে দেন রঙের কথা। একটু আগে সুগন্ধবিশিষ্ট কাগজের ফুল রঙ করছিল কিনা, তাই রঙের ছিটে। টুপিটা একেবারেই ফেজ টুপি, শুধু রঙটা সাদার বদলে করে দেওয়া হল গাঢ় হলুদ। চেহারায় বরফির মেকআপ-এর সঙ্গে একজায়গায় ভীষণ মিল। বৈজ্ঞানিকের থুতনিতে ছাগুলে দাড়ি, তবে কালো নয় ফুরফুরে সাদা। আর জোব্বার ব্যাপারটা তো আছেই। তবে বৈজ্ঞানিকের ল্যাবরেটরিতে ঢোকার আগে পর্যন্ত তার কারিকুরি সেভাবে কিছু দেখানো হয়নি। দেখা গেছে কেবল দূরবীনটি। 'অদ্ভুত শক্তি আতসকাচে। যোজন দূরের বস্তু চলে আসে দুই হাত কাছে।' দূরবীনটি কিন্তু বানানো হয়েছিল একেবারে সেকেলে জাহাজি দূরবীনের মত করেই।

□

হীরক রাজার সেটের দায়িত্বে ছিলেন অশোক বসু। যন্তর মন্তর ঘরটি তৈরির আগে সত্যজিতের স্পষ্ট নির্দেশ ছিল, এঘরে কোনও ভোজবাজির ব্যাপার থাকবে না। যতটা পারা যায় বিজ্ঞানসম্মত জিনিসপত্র রাখতে হবে। স্কুল-কলেজের ল্যাবরেটরিতে যেমন থাকে আর কি। অর্থাৎ টেবিলে থাকবে বেলজার, বকযন্ত্র, বুনসেন বার্নার, দেওয়ালে ঝুলবে কঙ্কাল, খাঁচায় থাকবে গিনিপিগ, বাদুড়, বাঁদর। আশ্চর্য জিনিস থাকবে একটিই – তা মস্তিষ্ক প্রক্ষালক যন্ত্র। আর থাকবে একটা কন্ট্রোল প্যানেল, যা দিয়ে ঐ যন্ত্রটা চালানো হয়। আর সেই আশ্চর্য রিভলভার – যার মুখ দিয়ে বুলেটের বদলে বেরয় আগুন। প্রথমেই জানা যাক, কীভাবে বানানো হল আগুনে রিভলবার। ঠিক রিভলবার নয়, একটু বড় – অনেকটা আজকালকার লিও টয়েজের সাব-মেশিনগানের সাইজে। তখন কলকাতায় লিও টয়েজ কোথায়? বিলিতি খেলনা বন্দুকের ডিজাইনে বানানো হল গোটাটা। তারপর লাইটার প্রযুক্তি কাজে লাগানো হল। অর্থাৎ ভেতরে চকমকি পাথর আর পেট্রল। এত সহজ কৌশল, অথচ শেষপর্যন্ত ব্যাপারটা দাঁড়াল তাকলাগানো। তবে বৈজ্ঞানিকের ঘরের আসল জিনিস হল মস্তিষ্ক প্রক্ষালক যন্ত্র আর তার কন্ট্রোল প্যানেল। মগজ ধোলাই যন্ত্রটা আসলে একটা অতিকায় দানবের মাথা। মুখের জায়গাটা গর্ত, তার ভেতরে ঘর। গোটা ডিজাইনটা সত্যজিৎ এঁকে দিয়েছিলেন। ডিজাইনটাই এত ভয়ানক ছিল যে তাতেই অনেকটা কাজ হয়ে যায়। বাকিটা ছিল কন্ট্রোল প্যানেলের মজা। উল্টোদিকে পরপর ছটি হাতল। হাতলগুলো থেকে একটা করে রঙিন তার বেরিয়ে দেওয়ালে ঢুকেছে। আবার সেখান থেকে বেরিয়ে ঢুকেছে দানবের মুখে। হাতলে চাপ পড়লে প্রথমে একটা শর্টসার্কিট ধরনের বিস্ফোরণ, তারপর ঘড় ঘড় করে দানবের মুখের সামনে অটোমেটিক দরজা বন্ধ হয়ে যায়। তারপর আলোর ফ্ল্যাশ, তারপরেই দানবিক গলায় মন্ত্র শুরু : 'বাকি রাখা খাজনা, মোটে ভাল কাজ না।' কোনও টিক

ফটোগ্রাফি নয়, গোটাটাই করা হয়েছিল যান্ত্রিক পদ্ধতিতে। আর কন্ট্রোল প্যানেলটা করা হয়েছিল ট্রেনের কেবিনরুমে যে দাঁড়ানো লিভারগুলো থাকে, হুবহু তার মত। যারা ট্রেনের কেবিনরুমে গেছেন, তারা একটু মন দিয়ে লক্ষ করলেই ব্যাপারটা বুঝতে পারবেন। পদ্ধতি খুব জটিল ছিল না, তবু

সম্মোহন কক্ষের ডিজাইন: সন্দীপ রায়

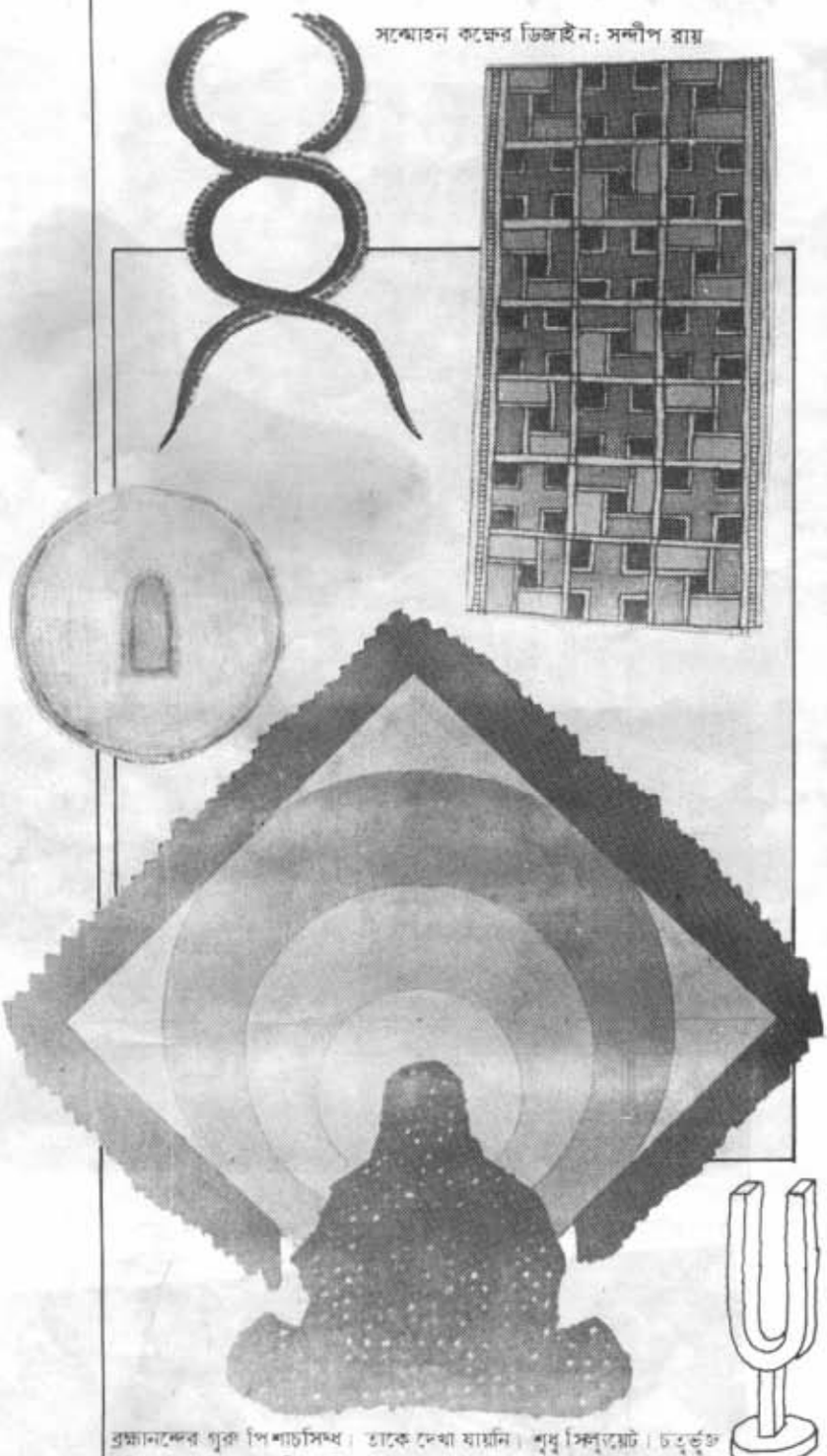

ব্রহ্মানন্দের গুরু পিশাচসিদ্ধ। তাকে দেখা যায়নি। শুধু সিলুয়েট। চতুর্ভুজ রঙিন ডিজাইন, খুব ধীর গতির আলোর স্ট্রোব আর গুরু গম্ভীর কণ্ঠস্বর। জমে গেল পিশাচসিদ্ধ।

স্পিলবার্গকে চমকে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট।

□

তিননম্বর ছবির পাকাপোক্ত ভিলেন ব্রহ্মানন্দ আর তার সম্মোহন কক্ষের ডিজাইন পুরোটাই পরিচালক সন্দীপ রায়ের। এবারও সঙ্গে অশোক বসু আর অনন্ত দাশ। ব্রহ্মানন্দের দাড়ি নেই, অথচ সাদা বাবরি চুল। আলখাল্লার উপরে চড়িয়ে নেওয়ার মত বেশ কয়েকটা জোব্বা আছে তার। সবকটারই রঙ লাল অথবা লালের উপর কালচে শেড। আলখাল্লা আর জোব্বায় ডবল বুল বা চড়াগদিনের শার্টের মত ছোট্ট বস্ত্রের ডিজাইন। জোব্বাগুলো চড়ানো থাকে ড্রাগনের মুখের মত হ্যাঙ্গারে। কপালে তান্ত্রিক স্টাইলে রক্তটীকা। হাতে রত্নখচিত অনেকগুলো আংটি। গলায় ছোট মড়ার খুলি বসানো হাড়ের মালা। ব্রহ্মানন্দ গড়গড়া টানেন আর ভালবাসেন শরবত। পাথরের গ্লাস।

□

ব্রহ্মানন্দের সম্মোহন কক্ষেও ঢুকতে হয় একটা সুড়ঙ্গ দিয়ে। লাল অর্ধবৃত্তাকার দরজা ঠেলে। ঘরের পাথুরে দেওয়ালে পাম, চক্র, কুলকুণ্ডলিনী আর তিব্বতী তন্ত্রের ডিজাইন। এককোণে ইংরেজি ইউ চিহ্নের মত ডম্বরু ঘণ্টা। আর ঘরের মধ্যে আশ্চর্য, গা ছমছমে কুণ্ড।

ব্রহ্মানন্দ হাত তোলেন, হাত কঙ্কালের হাতে পরিণত হয়, আঙুল থেকে বেরিয়ে আসে একটা বাঁকা বেগুনি আলোর রশ্মি। কুণ্ডে অগ্নিসংযোগ হয়। গোল হয়ে ঘিরে ঘিরে কুণ্ড জ্বলে ওঠে। চোখ সবুজ হয়। ব্রহ্মানন্দের সম্মোহন শুরু হয়। 'ওঁ গুরবে নমঃ।' বৈজ্ঞানিকের ল্যাবরেটরির মত এই ভয়ঙ্কর সম্মোহন কক্ষও তৈরি হয়েছিল কলকাতার ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে। কুণ্ডের আগুন একদিক থেকে যাতে আস্তে আস্তে অন্যদিকে এগিয়ে যায় তার জন্য একদিকে ঢাল রাখা হয়েছিল। যাতে দপ করে না জ্বলে যায়, তার জন্য পেট্রল আর কেরোসিন মিশিয়ে বিশেষ তরল দাহ্য তৈরি করা হয়েছিল। মাইকেল জ্যাকসনের 'মেকিং অফ থ্রিলার' যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা হয়ত বুঝতে পারবেন কীকরে ব্রহ্মানন্দের হাত মুহূর্তে কঙ্কালের হাতে পরিণত হল। কিন্তু আঙুল থেকে আগুন? চোখ সবুজ? উহুঁ এই স্পেশাল এফেক্টগুলো এখন বলা যাবে না মোটেই। ছবিটা এখনও চলছে কি না।

হীরক রাজার মূর্তির নাক ছিল

গল্প বলেছেন :- তপেন চট্টোপাধ্যায়, রবি ঘোষ, কামু মুখোপাধ্যায়

অযোধ্যা পাহাড়ের নিচে একমাস ধরে সে এক হৈ হৈ কান্ড। সেই যেমন আগেকার দিনে গ্রামের জমিদারবাড়ির দুর্গামন্ডপে একমাস ধরে চলত প্রতিমা গড়ার কাজ, সেরকমই হয়েছিল সেবার। হীরকের রাজার ১৮ ফুট মূর্তি তো আর কলকাতা থেকে বয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে না। তাই ঠিক হল, শিল্পী জিতেন পাল অযোধ্যা পাহাড়ের নিচে বসেই তৈরি করবেন পেল্লায় মূর্তিটা। বেসক্যাম্প হল মিসাম্ভি গ্রাম। প্রথমে শিল্প নির্দেশক অশোক বসু একটা ছোট মডেল গড়লেন। সেটা সামনে রেখে জিতেন পাল বসলেন মাটির তাল আর প্লাস্টার অফ প্যারিস নিয়ে। তারপর শুরু হল কর্মযজ্ঞ। প্রথমে বানানো হল মুন্ডুটা। সেটা নিয়ে এক বিপত্তি হয়েছিল, পরে বলছি। একটা মজার ব্যাপার ছিল হীরকের রাজার মুন্ডুতে। অর্ডার ছিল, এর নাকটা তৈরি করতে হবে এমনভাবে যাতে সহজে খোলা যায়। সেই যে ছেলেটা গুলতি মেরে নাক উড়িয়ে দিল রাজার, সেই দৃশ্যের জন্যই এরকম ব্যবস্থা রাখতে হয়েছিল। জিতেন পাল মুন্ডুটা তৈরি করে তাতে নাকটা নাইলন সুতো দিয়ে জুড়ে দিলেন নিখুঁতভাবে। শুটিঙের সময় এই প্রায় অদৃশ্য সুতোর একপ্রান্ত ধরা ছিল একজনের হাতে। গুলতি হীরকের রাজার নাকে লাগামাত্র সেই দড়িতে টান দেওয়া হল। আর নাক খুলে ছিটকে বেরিয়ে গেল। শুটিং হয়েছিল অযোধ্যা পাহাড়ের নিচে। মুশকিল বেধেছিল ধড়ের সংগে মুন্ডু জোড়ার সময়। বিশাল মূর্তির মাথায় মুন্ডু তোলার জন্য বাঁশের ভারা বাঁধা হল। কিন্তু বহু চেষ্টা করেও সেই মুন্ডু তোলা গেল না। তখন ইউনিটেরই কেউ উপায় বাতলালেন, দার্জিলিঙে যেভাবে মোট বয় কুলিরা সেভাবে তোলা হোক। তখন একজন মজুরের পিঠে বেঁধে দেওয়া হল মুন্ডুটা। সে সেইমত মুন্ডু বসিয়ে দিল ধড়ের ওপর। 'হীরক রাজার দেশে'র শেষটা কিন্তু তোলা হয়েছিল ইনডোরে, ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে। হীরকের রাজার বিশাল মূর্তি হুড়মুড়িয়ে পড়ে যাওয়া পর্যন্ত শুটিং হয়েছিল আউটডোরে। দলে দলে লোক পায়ের তলায় পিষে দিয়ে চলে যাচ্ছে রাজার মূর্তি, সেই দৃশ্য তোলা হয়েছিল ইন্দ্রপুরী স্টুডিওর ছাদে। ১৮ ফুট মূর্তিটা তো আর অযোধ্যা থেকে কলকাতায় ফেরত আনা সম্ভব নয়। সেজন্য ৭ ফুট আর একটা মূর্তি তৈরি করতে হয়েছিল। অবিকল একইরকম। ছাদে সেটাকে শুইয়ে ফেলে তার ওপর দিয়ে দৌড়ে যাওয়ার দৃশ্য তোলা হয়েছিল। ক্যামেরার কারসাজিতে ৭ ফুট মূর্তিটাকেই পর্দায় মনে হয়েছে ১৮ ফুট।

হীরের খনিতে কিন্তু কোন আউটডোর শট ছিল না। পুরোটাই তৈরি হয়েছিল ইন্দ্রপুরী স্টুডিওর ৬ নম্বর ফ্লোরে। খনি

নাইলন সুতো দিয়ে বাঁধা

নকসা করেছিলেন স্বয়ং সত্যজিৎ রায়। খনির ডিটেলে যাতে এতটুকু খুঁত না থাকে সেজন্য জি এস আই'র এক অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ারের পরামর্শ নিয়েছিলেন। নকসা অনুযায়ী অশোক বসু প্লাস্টার অফ প্যারিসের সংগে বালি মিশিয়ে তৈরি করলেন হীরের খনি। তাতে কালো রং স্প্রে করে দিলেন। হীরকের রাজার সংগে খনি দেখতে এসে গুপী বাঘার মত দর্শকরাও হাঁ হয়ে গেছিলেন, এত বাস্তবসম্মত হয়েছিল খনির সেট।

খনি ইনডোর হলেও, গুহার জন্য কিন্তু বরাবরই আউটডোর চেয়েছিলেন সত্যজিৎ রায়। যে সে গুহা হলে চলবে না। গুহার পাথর হতে হবে ধূসর। 'হীরক রাজার দেশে' ছবিতে গুহার ভেতরে খুব অল্প শটই ছিল। গুহার সামনে উদয়ন পন্ডিতের সংগে গুপী বাঘার দেখা হল, এই দৃশ্যটাই ছিল গুরুত্বপূর্ণ। অন্য কোন পরিচালক হলে হয়তো যে কোন গুহার সামনে শুটিং সেরে নিতেন। নয়তো স্টুডিওতে বানিয়ে নিতেন অর্ডারমাফিক গুহা। কিন্তু সত্যজিৎ রায় গুহার খোঁজে চষে ফেললেন গোটা দেশ। কিন্তু তাঁর মনোমত গুহা মিলল না। গুহার দৃশ্য বাদ রেখেই ইউনিট ফিরে চলল পুরুলিয়া ছেড়ে। অযোধ্যা থেকে বিষ্ণুপুরের পথে হঠাৎ সত্যজিৎ রায়ের নজরে পড়ল একটা অখ্যাত পাহাড়। গাড়ি থামাতে বললেন। আশ্চর্য, চলন্ত গাড়ি থেকে একলহমার জন্য তাকিয়েই উনি বুঝতে পেরেছিলেন ঐ দূরের পাহাড়টাই সেই পাহাড় যা উনি চাইছেন। খোঁজ নিয়ে জানা গেল ওটা জয়চন্ডী পাহাড়। গাড়ি থেকে নেমে উনি হেঁটে গেলেন পাহাড়ের কাছে। ঠিক হল, ওখানেই হবে গুহার দৃশ্যের শুটিং। পরদিন ইউনিট হাজির হল জয়চন্ডী পাহাড়ের নিচে। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, তপেন চট্টোপাধ্যায় আর রবি ঘোষকে নিয়ে শুটিং হল। যদিও গুহার ভেতরে ক্যামেরা ঢুকেছিল সামান্য সময়ের জন্য, কিন্তু আজ ভাবলে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে সেদিন সাক্ষাৎ মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছিলেন সৌমিত্রবাবু সহ ইউনিটের বেশ কয়েকজন কলাকুশলী। আসলে হয়েছিল কি, সেদিন নির্বিঘ্নে শুটিং সেরে ফিরে এসে পরদিন যখন আমরা কলকাতায় ফেরার তোড়জোড় করছি, শুনলাম ঐ গুহা থেকে একটা ১২ ফুট লম্বা ময়াল সাপ ধরা পড়েছে। আদিবাসীরা জানাল, সাপটা নাকি আস্ত শুয়োর খেয়ে নিশ্চিন্তে ঘুম দিচ্ছিল গুহার ভেতর। আমরা কিনা হাজার হাজার ওয়াটের আলো জ্বালিয়ে, লোকলস্কর নিয়ে গোটা দিন দাপিয়ে বেরিয়েছি ওর দশ হাতের মধ্যে। সৌমিত্রবাবুকে নিয়ে যখন শুটিং চলছিল গুহার ভেতর, তখন যদি মহারাজের ঘুম ভাঙত, কি হত কে জানে! গুপী অবশ্য রোমহর্ষক কাহিনী শুনেটুনে খুব নিশ্চিন্ত গলায় বলেছিল, 'কি আবার হত? আমি গান ধরতুম, পায়ে পড়ি সাপমাসী... ।

কুম্ভলগড় দুর্গে ব্রহ্মানন্দের কেল্লা

সন্দীপ রায়

দুর্ধর্ষ শুটিং

গুপী বাঘার বয়স বাড়লেও আমি তো সেই ১২ বছর আগেকার 'হীরক রাজার...' জুতোই এই ছবিতে ব্যবহার করেছি। 'গুগা বাবা'-র অনেক জিনিসই হারিয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে, গুপী বাঘার জুতোও হারিয়েছে। তবে 'হীরক রাজার' জুতোগুলো ছিল। একটু পালিশ আর মেরামত করে এবার কাজে লাগানো হয়েছে। জুতোগুলো মেরামত যিনি করেছেন তিনি আগেও আমাদের প্রয়োজনে চমৎকার সব জুতো আর নাগরা তৈরি করে

দিয়েছেন। জুতোর মতই 'হীরক রাজার...' ঢোলটাও এ ছবিতে ব্যবহার করা হয়েছে। এটা আমাদের কাছেই ছিল। মানে স্টুডিওতেই ছিল। কাপড়-টাপড় সব একই রেখেছিলাম, তবে স্ট্র্যাপটা খারাপ হয়ে যায়। ওটা পাল্টাতে হয়েছে। এখানে একটা ঢোলেই কাজ সেরেছি। 'গুগা বাবা'য় তো আবার দুটো ঢোল ছিল। একটা সত্যিকারের আরেকটা ডামি। বরফে গড়াগড়ির দৃশ্যে ডামি ঢোলটা ব্যবহার করা হয়েছিল।

ঢোলের সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা জিনিসের কথা মনে পড়ে গেল। সেটা গুপী বাঘার টুপি। তবে এছবিতে ওরা বেশিরভাগই পাগড়ি পরেছে। **শুণ্ডীর রাজার** সেই অদ্ভুত উল্টোহাড়ি-মার্কা টুপিও পরতে হয়েছে। ছদ্মবেশের সময় ওরা পরেছে রাজস্থানি পাগড়ি। এগুলো একেবারে রেডিমেড। ওরা তো হাততালি দিয়ে যা খুশি তাই পেতে পারে। হাততালি দিয়ে তাই শুধু পাগড়ি নয়, টুপিও **ওরা পায়**। 'হীরক রাজা...'য় তো আবার মুকুটের ব্যাপার ছিল। এখানে মুকুট না থাকলেও অন্যরকমের একটা মজা রয়েছে। দু-দুটো ছদ্মবেশে এরা সাত-আট রকমের পোশাক পাল্টিয়েছে। যাঁরা ছবিটা দেখেছেন বা দেখবেন তাঁরা এই মজাটা বুঝতে পারবেন। পোশাক পাল্টানোর ব্যাপারটা এ ছবির একটা বড় মজা। ২০ থেকে ২২ বার পোশাক পাল্টাবার দৃশ্য রয়েছে। রাজসভায় তো ওরা সকলকে খুশি করার জন্য পোশাক বদলের একটা জাদুই দেখিয়েছে। শুন্ডির রাজা হিসেবে যখনই বলছে 'শুন্ডির রাজা আমরা এখন' সঙ্গে সঙ্গে ওদের গায়ে উঠেছে শুন্ডির রাজার পোশাক। গ্রাম্য পোশাক ওরা যেটা পরেছে সেটা অনেকটা 'সন্দেশ'-এ আঁকা উপেন্দ্রকিশোরের ছবির মতই। নিজেদের মধ্যে ওরা কিন্তু ঐ গ্রাম্য পোশাকেই বেশি আরাম পায়।

কোথায় কোথায় এ ছবির আউটডোর শুটিং সেটা নিশ্চয়ই অনেকে জানতে চাইবেন। ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে অনেকটাই কাজ হয়েছে। প্রথম আউটডোর ছিল বর্ধমানের কাছে মেমারিতে একটা বাঁশবনে। ওখানে একদিন মাত্র শুটিং ছিল। এরপর ওড়িশায়। ব্রাহ্মণী নদীর তীরে লোকেশন ছিল। কটক দিয়ে যেতে হয়। দু-ঘন্টার পথ। গল্পে একটা নদীর ব্যাপার আছে। গহনা নদীর তীরে আনন্দপুর। তবে ছবির ক্ষেত্রে নদীটা খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। আমি দেখলাম নদীটা থাকলে বেশ একটা

ব্রেক হয়। তাই ব্রাহ্মণীর তীরে শুটিংটা সারলাম। এরপর জঙ্গল। ওড়িশারই ঢেনকানলের জঙ্গলে। কাছেই পেয়ে গেলাম উদয়গিরি খন্ডগিরি। জঙ্গল পাহাড় একসঙ্গেই হয়ে গেল। এরপর শুটিং করেছি পুরীতে। ঠিক পুরীতে নয় একটু দূরে তোষালি স্যান্ডস-এ। ফিরে এসে শান্তিনিকেতনে। ওখানে খোয়াইয়ে গানের দৃশ্য টেক করা হয়েছে। আস্তে আস্তে পুরনো জায়গায় ফিরে যাচ্ছি। কারণ একটাই। গুপী বাঘা গ্রামের দিকে যাচ্ছে। এরপর দুবরাজপুর। বাবা যেখানে 'অভিযান'-এর শুটিং করেছিলেন। তারপর গেলাম একটা সাঁওতাল গ্রামে, নাম বনেরপুকুর। চমৎকার গ্রামটা। ওখান থেকে শুটিং সেরে ফিরেই বাবাকে বলেছিলাম জায়গাটার কথা। পরে ওখানেই 'আগন্তুক'-এর শুটিং হয়েছে। আর যাঁরা এ ছবি দেখেছেন, তাঁরা তো জানেন, এ ছবিতেও মরুভূমি রয়েছে। রয়েছে দুর্গ। দুর্গের জন্য রাজস্থানের উদয়পুরেই শুটিং করেছি। ওখানকার লেক প্যালেস আর অন্যান্য দুর্গগুলোকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করেছি। উদয়পুরের কাছে 'কায়া'য় তো লোকজন, ভিড় ভাট্টা নিয়ে বেশ বড় গানের একটা দৃশ্য টেক করা হয়েছিল। রাজস্থানে একটা অদ্ভুত ব্যাপার হল। মানে ঐ দুর্গটাকে নিয়ে। গাড়িতে যেতে যেতে এক কিমি আগেও বোঝা যায় না সামনে একটা বিশাল দুর্গ রয়েছে। হঠাৎ বাঁক নেওয়া মাত্র চোখের সামনে যেন লাফিয়ে ওঠে দুর্গটা। এভাবেই আমরা হঠাৎ পেয়ে গেলাম কুম্ভলগড় দুর্গ। দুর্গটা এক কথায় অসাধারণ। সোনার কেল্লার পর চোখ ছানাবড়া হয়ে যাবার মত দুর্গ। দুর্গটা একটু উঁচুতে। সবটা তো ক্যামেরায় ধরতেই পারলাম না। এত বড়। লম্বায় প্রায় এক কিলোমিটারও হতে পারে। আসলে বাবা রাজস্থানটা এমন গুলে খেয়েছেন যে নতুন কিছু ওখানে খুঁজে পাওয়া খুব মুশকিল। আমি 'ফোর্টস্ অফ ইন্ডিয়া'তে কুম্ভলগড়ের ছবি পাই। রঘুবীর সিং-এর রাজস্থান বইটাতেও দেখেছিলাম। দারুণ লেগেছিল। অদেখা দুর্গ আমাকে প্রায় খুঁজে বার করতে হয়েছে। দুর্গ খুঁজতে তো আমরা ভুটানেও চলে গেছিলাম। ওখানকার পারোতে দুর্গ আছে একেবারে সেইসব কুরোসাওয়ার ছবির মত। ওখানকার দুর্গকে বলে জং। ডাক্তার কাম পিয়ানিস্ট আদি গজদার আমাদের খুব পরিচিত। উনি ভুটানে দুর্গ দেখার প্রস্তাবটা দিয়েছিলেন। দেখলাম। ভালও লাগল। তবে শুটিং-এর পারমিশন পেলাম না। যেই শুনল, আমার ছবির প্রযোজক পশ্চিমবঙ্গ সরকার, সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'নিশ্চয়ই এডুকেশনাল ছবি'? তারপর বলল শুটিং-এর পারমিশন পেতে হায়ার অথরিটির সঙ্গে দেখা করতে হবে, সেখানে দেখা করতে গেলে নাকি স্যুট পরে যেতে হয়। আমি তখনই বুঝে গেছি পারমিশন আর হল না। আমি বললাম স্যুট পরে তো যেতে পারব না, জ্যাকেট পরে আছি; এতে যদি হয় তবে ঠিক আছে। কিন্তু ওরা এতে রাজি হল না। এর মধ্যে হয়ত অনেকেই জেনে গেছেন, এ ছবিতে শুধু দুর্গ নয়, একটা গানে বরফের ব্যাপারও আছে। গত মার্চের শেষের দিকে আমার স্ত্রী ললিতা ফোন করে খোঁজ নিতে শুরু করেছে সিমলায় এখনও বরফ পড়ছে কিনা। মার্চে সিমলায় বরফ পাওয়া কি যে-সে ব্যাপার। অনেকে বললেন কুফরিতে চেষ্টা কর। গুগা বাবা-র বরফের দৃশ্যটা মনে আছে? ওটা কুফরিতেই তোলা হয়েছিল। কাশাকা থেকে মাত্র দুটো গাড়িতে সকলে মিলে সিমলা পেরিয়ে চললাম কুফরি। কিন্তু কুফরিতে গিয়ে তো আমরা বেজায় হতাশ! কোথায় বরফ? দু এক জায়গায় চাবড়া চাবড়া কিছু বরফ পড়ে আছে। আর সব তো একেবারে পরিষ্কার। আমরা সঙ্গে করে হিমাচল প্রদেশের ট্যুরিস্ট বুকলেট নিয়ে গেছিলাম। ওখানে নারকান্ডার সন্ধান পেলাম। ওটা একটা স্কি রিসর্ট। কুফরিতে বরফ না পেয়ে ঠিক করলাম নারকান্ডায় একবার চেষ্টা করব। শেষ চেষ্টা। কুফরি থেকে নারকান্ডা খুব একটা দূরেও নয়। মাত্র ৫৫ কি মি। নারকান্ডায় গিয়ে সত্যিই আমরা বরফ পেলাম। পথে যে কি টেনশন। সত্যি বরফ পাব তো। নারকান্ডা থেকে আসা গাড়িগুলোর দিকে লক্ষ্য রাখলাম। ঠিক গাড়ির দিকে নয়, গাড়ির চাকার দিকে। বরফ পড়লে চাকা যাতে স্কিড না করে তার জন্য গাড়ির চাকার সঙ্গে চেন বেঁধে

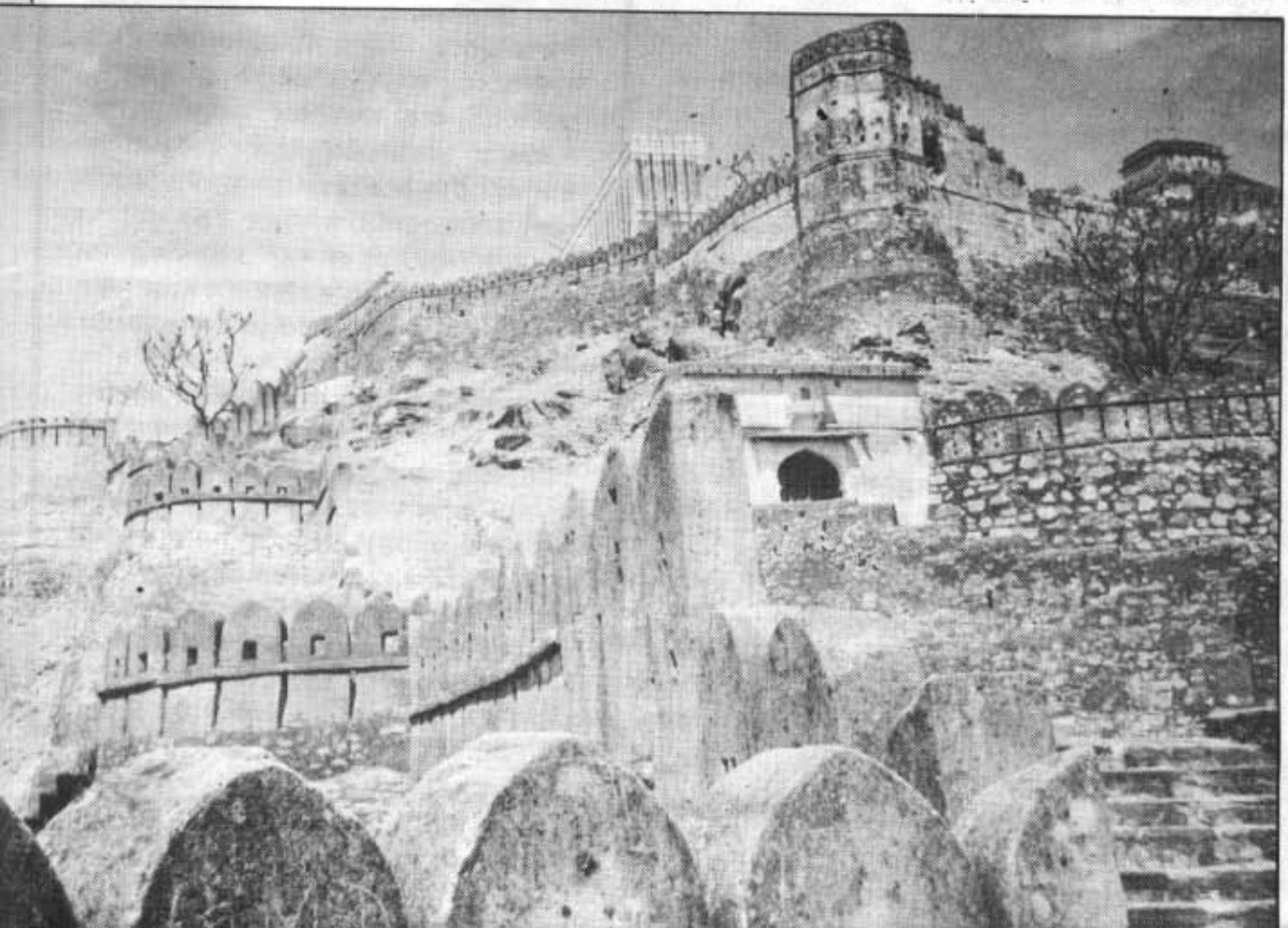

দেয় ওরা। এরকমই কয়েকটা গাড়ির চেন দেখে একটু স্বস্তি হল। নারকান্ডায় সত্যি বরফ পড়ছে। ওখানে গিয়ে একেবারে ঝটপট শুটিং সেরে নেওয়া হল। মাত্র ১ ঘণ্টার মধ্যেই শুটিং শেষ। তখনও বরফ পড়ছে। আমরা সেদিনই আবার রওনা হলাম। কালকা মেল ধরে পরদিনই সকালে ফিরে এলাম দিল্লি। আর তারপরেই রওনা হলাম রাজস্থান। জটায়ু বলেছিলেন 'ফ্রম দা ফ্রাইং প্যান টু ফ্রিজিডেয়ার'। এক্ষেত্রে উল্টোটা হল। ফ্রিজিডেয়ার থেকে আমরা চললাম ফ্রাইং প্যানে।

'গুগাবাবা'র মতই 'গুপী বাঘা ফিরে এলো'-তে মরুভূমি বরফ সবই রয়েছে। তবে বাঘ নেই। বাঘ নেই বলব না। ওরকম ক্যাটাগরির কিছু একটা আছে। তবে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার নেই। তাছাড়া এ ছবিতেও ম্যাজিক আছে। বরফি ম্যাজিক জানে, বৈজ্ঞানিক ম্যাজিক জানে। এখানে ব্রহ্মানন্দও ম্যাজিক জানে। কিন্তু বরফি বা বৈজ্ঞানিক কেউই ঠিক ভিলেন ছিল না। 'গুগাবাবা'য় আসল ভিলেন তো মন্ত্রী জহর রায়, বরফিকে ওর সাহায্যকারী বলা যায়। বৈজ্ঞানিকও হীরক রাজার সভারই অঙ্গ। কিন্তু ব্রহ্মানন্দ একেবারেই ভিলেন। ওর বিরুদ্ধেই লড়াই। ও নানারকম ক্ষমতার অধিকারী। পিশাচসিদ্ধের শিষ্য। এর আগে ও ছিল আবার দস্যু। ফলে লোভও ছিল। তাই গুরু ওকে সব মন্ত্র দেননি। কিছুটা দিয়েছেন। সম্মোহন করতে পারে, নানারকম সুপার ন্যাচারাল ক্ষমতা আছে। ব্রহ্মানন্দ চরিত্রটা বেশ সিরিয়াস। ওর ম্যাজিকটাও অন্যরকম। এমনিতে ছবিতে জাদুর দৃশ্য তো একেবারে শুরু থেকেই রয়েছে। গানের কথাতেই রয়েছে 'রাজসভাতে জাদুর হবে বাজি/মোরা এককথাতেই রাজি।' জাদুর দৃশ্যেই তো রয়েছে কস্ট্যুম চেঞ্জ। এই জাদুর দৃশ্যটা তৈরি করতে জুনিয়র পি সি সরকার খুব সাহায্য করেছেন। রাজসভায় যেসব জাদুকরকে দেখা যাবে, তাদের যোগাড় করার ব্যাপারেও ওঁর সাহায্য পেয়েছি। গোটা দৃশ্যটা অবশ্য এক-দেড় মিনিটের। আর ম্যাজিক ম্যাজিকই। পেশাদার ম্যাজিক ছাড়া ব্যাপারটা কখনই জমে না। ঐ দৃশ্যে আমিও একেবারে সোজাসুজি ম্যাজিক দেখাতেই চেয়েছি। কোনও ক্যামেরার কারসাজি নেই। একেবারে বিশুদ্ধ জাদু। আর ব্রহ্মানন্দের ব্যাপারটা তো মাদ্রাজের প্রসাদ ল্যাবরেটরির অবদান। ক্যামেরার ট্রিক।

হ্যাঁ, এ ছবিতে ভূতের রাজা আবার ফিরে এসেছেন। আগেরবার ভূতের রাজা হয়েছিলেন প্রসাদবাবু, উনি তো মারা গেছেন। এবার এই রোলটা করেছেন রমেশ মুখার্জি। ভূতের রাজার বয়সটা অবশ্য বাড়াইনি। আগের মতই এখানেও ভূতের রাজা এসেছেন স্টারের মধ্যে দিয়ে। 'গুগাবাবা'-র সময় অনেকে বলেছিল দারুণ, কিন্তু তারার বাল্বটা যেন কেমন বোঝা যাচ্ছে। স্ট্রাকচারটাও দেখা যাচ্ছে। এবার আশা করছি সেটাও বোঝা যাবে না। ভূতের রাজা এখানে এবার অনেক বেশি পজিটিভ রোল প্লে করছেন। জ্ঞানী-গুণী ভূত বলা যায়। মোটামুটি 'গুগাবাবা' আর আমার ছবিতে ভূতের রাজার অ্যাপিয়ারেন্সটা একই। তারার ব্যাপারটাও একই রয়েছে। শুধু ওটা ছিল সাদা-কালোয়, আর এটা রঙিনে। ভূতের রাজার গলায় আগের মত গানও আছে। আগেরবার বাবা নিজেই গেয়েছিলেন। আমাদের একটা জার্মান 'উহের' টেপরেকর্ডার আছে। ওতে চারটে স্পিড রয়েছে। বাবা গানটা রেকর্ড করে স্পিড ভ্যারি করিয়ে ভূতের রাজার গলায় বসিয়েছিলেন। এবার আমি অবশ্য গোটাটা ক্যাসেটে করেছি। ◆

ভদ্র চিতাবাঘ

সন্দীপ রায় বলেননি বটে, কিন্তু এই লোভনীয় তথ্যটা চেপে রাখা গেল না। বিশেষ করে যখন এই দুর্ধর্ষ শুটিঙের গল্পে প্রথম দুটি ছবিরই বাঘের গল্পটা স্বয়ং সত্যজিৎই বলে গেছেন। তিন নম্বর ছবি 'ফিরে এলো'তেও বাঘ আছে বৈকি। তবে রয়েল বেঙ্গল নয়, চিতাবাঘ। গুপী বাঘা ব্রহ্মানন্দের পাল্লায় পড়ে রাজস্থানী পোশাকে গেছে কাঞ্চনপুরের রাজার মাথার রত্নটা আনতে। শোভাযাত্রা করে রাজা কাম্মু মুখার্জি চলেছেন পালকিতে। তার মাথায় মুকুট নেই। গুপী বাঘা অন্য পালকিতে উঁকি দিয়ে দেখল তার মধ্যে চিতাবাঘটি বসে। মাথায় পাগড়ি, পাগড়িতে রত্ন। গুপীবাঘা সেটা খুলে নেবে। এই হল দৃশ্য। এবারও শুটিং হল মাদ্রাজের প্রসাদ স্টুডিওতে। চিতাবাঘ সপ্রাই করল সিনেমায় যারা জন্তুজানোয়ার সাপ্লাই করে তারাই। প্রসাদ স্টুডিওর আউটডোরে বানানো হল দুদিক খোলা পালকি। বাঘ এসে বসে পড়ল পালকির ভেতর। শক্ত নাইলনের তার দিয়ে টেনার ব্যান্ড বেঁধে দিলেন, যাতে পালকি থেকে বাঘ বাইরে ঝাঁপ না দেয়। বাঘের মাথায় শক্ত করে বেঁধে দেওয়া হল রত্ন সমেত পাগড়ি। এইবার গুপী তপেনকে শুধু রত্নটা খুলে নিতে হবে। চমৎকার অভিনয় করেছিল চিতাটি। গুপী বাঘা দুজনেই স্বীকার করে ভারি ভদ্র বাঘ। পালকির বাইরের দৃশ্যটা অবশ্য শুটিং হয়েছিল রাজস্থানের আউটডোরেই।

হুসেনের গুপী গাইন বাঘা বাইন

ছবি □ অমিত ধর

গুপী গাইন বাঘা বাইন ছবিটি প্রথম দর্শনে ভাল লাগেনি মকবুল ফিদা হুসেনের। মতামতটা নিজেই জানিয়েছিলেন সত্যজিৎবাবুকে। পরে অবশ্য বদলে যায়। যত দেখেন ততই বদলাতে থাকে। এর মিউজিক, অসংখ্য সিকোয়েন্স, অসাধারণ ফ্যান্টাসি আজও হুসেনের স্বপ্নের মধ্যে ঘুরঘুর করে। তাই হোর্ডিংয়ে গ্রেটমাস্টারকে শ্রদ্ধা সিরিজের অন্যতম ছবি হিসেবে গুগাবাবাকে বেছে নেওয়া। এ তথ্য জানালেন হুসেন নিজেই। বাঙ্গালোরে কথা বলার সময়। ৩০ মে। তাঁকে বলেছি, সত্যজিতের ছবির সঙ্গে আপনার ছবির অসঙ্গতি আছে। গুপীর হাতে বীণা কেন? ঘোড়া কেন? বললেন, আমার স্বপ্নে থাকা ছবিটি এইরকম। গোটা রূপকথাটি ধরতে চেয়েছি একটি ফ্রেমে। আর হোর্ডিংয়ে সরাসরি যোগাযোগের ব্যাপারটাও মাথায় রাখতে হয়েছে। হুসেনের ছেলেবেলার শহর বরোদায় এই রূপকথার গায়ে আরও রঙ লাগানোর কথা ছিল গত ১৮ মে। শেষপর্যন্ত হয়নি। অসুস্থতার জন্য।

মধুময় পাল

মহারাজা সত্যিই হাঁ

অনুপ ঘোষাল

ছবি: সন্দীপ রায়

সত্যজিৎবাবু গান শেখাতেন পিয়ানো বাজিয়ে। হারমোনিয়াম ব্যবহার করতেন না। পিয়ানো বাজানোয় তাঁর দক্ষতা দেখে অবাক হয়েছিলাম। আরও অবাক হলাম নোটেশন স্ট্যান্ডে স্টাফ নোটেশনের স্ক্রিপ্ট দেখে। যা ওঁর নিজেরই করা। মনে মনে ভাবলাম, স্টাফ নোটেশনও জানেন? গানগুলি শেখানোর পর উনি নিজের হাতে প্রত্যেকটির কথা ও আ কার মাত্রিক স্বরলিপি লিখে দিলেন। নিখুঁতভাবে গান তোলার জন্য। শব্দ উচ্চারণের ব্যাপারেও ওঁর ছিল তীক্ষ্ণ নজর। কোন কিছুই একেবারে ওঁর মনের মত না হলে অ্যাপ্রুভ করতেন না।

গুপী গাইনের রেকর্ডিং পর্ব শুরু হল। টালিগঞ্জের ইন্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরিতে। রেকর্ডিংয়ের কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা আমার ছিল না। তাই স্কোরিং থিয়েটারে ঢুকে তো বেশ হকচকিয়ে গেলাম। এতবড় স্টুডিও। চারপাশে বিচিত্র সব যন্ত্র আর যন্ত্রীদের দেখে সত্যি বলতে কি, বেশ ঘাবড়েই গেলাম। প্রথম তিনদিন চলল শুধু রিহার্সাল। অর্কেস্ট্রার সঙ্গে পরের তিনদিন ধরে হল রেকর্ডিং

রেকর্ডিংয়ের সময় সত্যজিৎবাবুর সংগীতচেতনা, উদ্ভাবনী ক্ষমতা, যন্ত্র নির্বাচনের দক্ষতা দেখে বিস্মিত হয়েছিলাম। ইন্টারলিউড-প্রিলিউডে গতানুগতিকতার ঊর্ধ্বে এক অভিনবত্বের সন্ধান পেলাম। শুধু কথা আর সুরই নয়, প্রতিটি গানের অর্কেস্ট্রেশনও ছিল তাঁরই। কোন যন্ত্রী কে কখন কোন স্কেলে কোন পিস বাজাবেন, সবই থাকত তাঁর নখদর্পণে। গুপীর প্রথম গান 'দ্যাখরে নয়ন মেলে, জগতের বাহার।' প্রথম শেখানোর সময় গানটি আরও বড় ছিল। মুখড়া ছাড়া দুটি অন্তরা ছিল। 'দ্যাখরে চারিপাশে/দ্যাখরে ঘাসে ঘাসে/দ্যাখরে নীলাকাশে/আহা মরি কী বাহার/দিনের আলোয় কাটে অন্ধকার। দ্যাখরে নদী জলে/দ্যাখরে বনতলে/দ্যাখরে ফুলে ফুলে/আহা মরি কী বাহার/দিনের আলোয় কাটে অন্ধকার।' খট্-ভৈরবী রাগ-মিশ্রিত এই গানটি রেকর্ডিংয়ের কিছু আগে আমাকে আবার অন্যভাবে শেখালেন। যেভাবে এখন আপনারা শোনেন। গানটি একবার ভাবুন। হঠাৎ গুপীর গলায় সুর এসে গেছে। ভূতের রাজার বরে। যে কোন লোকই তো চাইবে সব সুরে গলা কেমন যায় পরখ করতে। গুপীও তাই চাইল। আর সুরের প্যাটার্নে কি অসাধারণভাবেই না এসে গেল সেই মুড। বাঁধনহারা আনন্দ স্পষ্ট হয়ে উঠল সেই সুরে। বাঘাও বর পেয়েছে। সেও কম যায় কিসে! তাই ঢোলের রোলিং ব্যবহার করা হল। আর মুহূর্তে ফুটে উঠল বাঘার মনের স্ফূর্তি। এইখানেই সত্যজিৎবাবুর বৈশিষ্ট্য। 'ওরে বাবা দেখ চেয়ে, কত সেনা চলেছে সমরে' গানটির ইন্টারলিউড অংশে সরোদের একটা অংশ ছিল। আশীষ খান বাজাচ্ছিলেন। যে স্কেলে বাজাতে হচ্ছিল তাতে ওর অসুবিধে হচ্ছিল। খেয়াল করা মাত্র সত্যজিৎবাবু বদলে দিলেন। যাঁরা সংগীতচর্চা করেন তাঁরা বুঝবেন, কতখানি গভীরতা থাকলে তবেই না এ কাজ সম্ভব। বাঘা বাঘা যন্ত্রীরা পর্যন্ত তাঁর নির্দেশ মেনে নিতে বাধ্য হতেন। 'ওরে বাঘা রে, বাঘা রে' গানটি খেয়াল করুন। দক্ষিণী সুরের চরিত্র বজায় রাখতে গানটিতে উনি বীণা, গঞ্জিরা, ঘটম্ প্রভৃতি যন্ত্রের ব্যবহার করেছিলেন। 'মহারাজা তোমারে সেলাম' গানটিতে খাঁটি বাংলাদেশের সুরের ছোঁয়া। হাজির সব ওস্তাদের সঙ্গে টক্কর দিচ্ছে গুপী বাঘা। শুরুতেই তাই চমক। 'মহারাজা' বলে সুর পঞ্চমে ৫৮ মাত্রার লম্বা টান। যা শুনে সত্যি সত্যি হাঁ হয়ে গেলেন ছবির মহারাজা সন্তোষ দত্ত। আর শেষে, আবার মহারাজা বলে তানকর্তব। এবার সমস্ত ওস্তাদকে চমকে দিয়ে। তাতেই বাজীমাৎ।

'হীরক রাজার দেশে' যেহেতু 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' ছবির পরের পর্ব, তাই সুরে একইধরনের কন্টিনিউটি ছিল। কিন্তু কোথাও তা একঘেয়ে নয়। 'হীরক রাজার দেশে'র শুরুতে গুপী বাঘা যখন প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করছে, তখনকার গানের কথা, সুর সব যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়ে অদ্ভুত এক আবহ তৈরি করেছে। 'আহা সাগরে দেখ চেয়ে/এ কি দৃশ্য দেখি অন্য/এ যে বন্য, এ অরণ্য/এবারে দেখ গর্বিত বীর/চির তুষার মন্ডিত শির'– বিদেশি ছবিতে একধরনের 'এফেক্ট সঙ' ব্যবহার করা হয়। এও ঠিক তাই। যা এদেশীয় অন্য কোন ছবিতে শুনেছি বলে মনে পড়ে না। 'ধর না কো সান্ত্রীমশাই' গানটিতে পাশ্চাত্যধর্মী সুর ব্যবহার হলেও চরিত্রে তা আদ্যান্ত ভারতীয়। মনেই হয় না বিদেশি সুর শুনছি। ভারতীয় সংগীতের রাগরাগিনীর ওপর সত্যজিৎবাবুর এত ভাল দখল ছিল যে প্রয়োগেই তার প্রমাণ। মাজ-খাম্বাজ-এ 'মোরা দুজনায় রাজার জামাই', 'পায়ে পারি বাঘ মামা' – গানে পুরিয়া ধানেশ্রী রাগের ছোঁয়া। 'গুপী বাঘা ফিরে এলো' ছবিতে লোকায়ত মেজাজের বৈতালিক গানটি 'কেমন বাঁশি বাজায় শোন, মাঠেতে রাখাল' 'রাখালিয়া' গানের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। আবার দক্ষিণী সুর ব্যবহার করা হয়েছে 'মোরা আসি ধেয়ে ধেয়ে' গানটিতে।

রাজার ঘরে ফোয়ারা

এই পাতায় ব্যবহৃত যাবতীয় ডিজাইন সত্যজিৎ রায় ও সন্দীপ রায়ের আঁকা।

আচ্ছা, কজন রাজার সঙ্গে গুপী বাঘার এখন পর্যন্ত দেখা হয়েছে? চট্ করে বলা মুশকিল। সময় নিয়ে গোনাগুনতি করে বলতে হবে। সত্যি তো শুরু সেই গুপী গাইন বাঘা বাইন ছবি থেকে। মাঝখানে হীরক রাজার দেশে আর শেষে গুপী বাঘা ফিরে এল। সব মিলিয়ে রাজা, মন্ত্রী, সেনাপতি, পাত্র, মিত্র অমাত্য, সভাসদ, বিদূষক মোটেও কম কিছু হবে না। সবাইকে নিয়ে গোনাগুনতি করা মোটেও সহজ কম্ম হবে না। তবে চোখ বুজলেই ভেসে উঠছে দুর্দান্ত সব রাজপ্রাসাদ, মজাদার আর অদ্ভুত রাজ সিংহাসন, জমকালো রাজ দরবার, চোখ ধাঁধানো শোবার ঘর। যেন সবে উঠে এসেছে রূপকথা গল্প থেকে! যে একবার করে ছবি তিনটে দেখেছে, তারই মনে পড়বে সব। ছবি শেষ হলে এ জিনিস চোখের সামনে থেকে মুছে যাচ্ছে বটে, কিন্তু থেকে যাচ্ছে মনের ভেতরে। গুপী গাইন বাঘা বাইন আর হীরক রাজার দেশে ছবিতে এতসব মাথা ঘুরিয়ে দেওয়ার মত সেটের ডিজাইন তৈরি করেছিলেন সত্যজিৎ রায়। আর গুপী বাঘা ফিরে এলো-র মন ভোলানো সেটের ডিজাইন তৈরি করেছেন সন্দীপ রায়। একেবারে প্রথম ছবিটিতে ডিজাইনগুলো সব সত্যিকারের চেহারা দিয়েছিলেন শিল্প নির্দেশক বংশীচন্দ্র গুপ্ত। পরের দুটো ছবির সময় এই কাজ করেছেন শিল্প নির্দেশক অশোক বসু। গুপী বাঘার তিনটি ছবির সেট বানানোর জন্য এই দুই শিল্প নির্দেশকের বাহাদুরির কথা তো ছবি তৈরির ইতিহাসে লেখা হয়েই গেছে। কিন্তু অনেক ছোটরা কিন্তু এখনও মনে

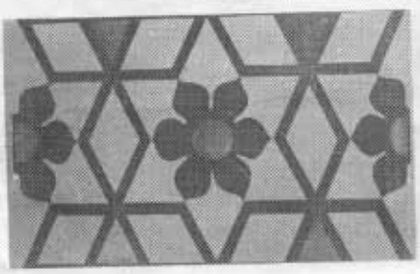

করে সত্যজিৎ আর সন্দীপ নিশ্চয়ই ভূতের রাজার বর পেয়েছিলেন। নইলে অমন রাজদরবার, অমন সিংহাসন, অমন ফোয়ারা দেওয়া শোবার ঘরের কথা ওঁদের মাথায় এল কেমন করে?

দেখা যাক কেমন ছিল –

সিংহাসন

তিনটে ছবিতেই অনেক রাজা, অনেক মন্ত্রী আর তাঁদের অনেক সিংহাসন। তবে গুপী গাইন বাঘা বাইন ছবিতে হল্লার রাজা যে ফুলের পাপড়ির মত সিংহাসনটির ওপর একবার এসে বসেছিলেন সেটির বুঝি তুলনা নেই। ওই ফুলের মত সিংহাসনে আধশোয়া অবস্থায় বসে দুষ্ট মন্ত্রীর সঙ্গে তিনি যুদ্ধের পরিকল্পনা ফাঁদছিলেন। মনে হচ্ছিল নিষ্ঠুর রাজাটা যেন বেছে বেছে এসে ফুলের পাপড়ির ওপর বসেছে! হাল্লার রাজার মন্ত্রীর সিংহাসনটাও মনে রাখার মত বৈকি। দুপাশে দুটো ইয়া বড় বাইসনের সিং। পিঠের ওপর রাখা মুণ্ডু সহ ভাল্লুকের চামড়া। ভাল্লুকের মুণ্ডুটা অবশ্য উল্টো দিকে। সিংহাসনেই মন্ত্রীর ভয়ানক চেহারাটা ফাঁস হয়ে গেছে। গুপী বাঘা ফিরে এলো ছবিতে মজাদার একটা সিংহাসন তৈরি করেছিলেন সন্দীপ রায়। শঙ্খপুরের রাজার সিংহাসন। অনেকটা উঁচুতে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হয়। হীরক রাজার দেশেতে হীরক রাজার সিংহাসনেও ছিল হীরের নকশা। গুপী গাইন বাঘা বাইনে

হাল্লার মন্ত্রীর সিংহাসন

হাল্লার রাজার সিংহাসন

শুণ্ডির রাজদরবার, সিংহাসন

আনন্দপুরের রাজদরবার

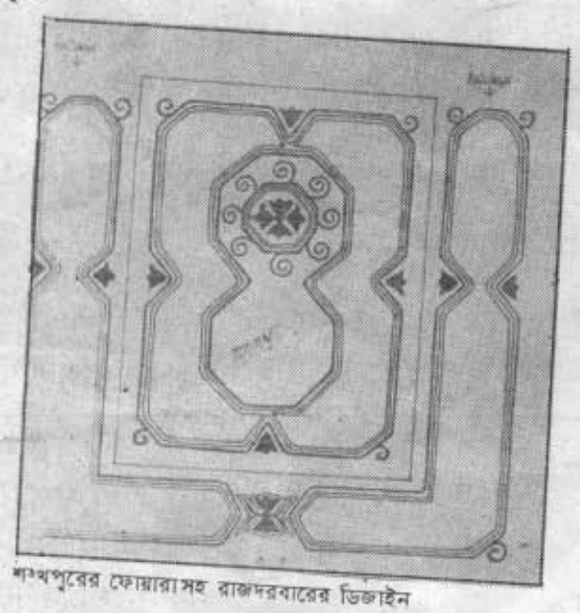

শঙ্খপুরের ফোয়ারাসহ রাজদরবারের ডিজাইন

হাল্লার রাজার রাজদরবার

শুণ্ডী রাজার সিংহাসনটা রাজার মনের মতই সাদা আর ছিমছাম। অন্যদিকে গুপী বাঘা ফিরে এলো-তে তান্ত্রিক ব্রাহ্মণদের ডেরাতেও একটা সিংহাসন দেখা গেছে। অনেকটা চেয়ারের মত। রাজস্থানী কায়দার। পিঠ উঁচু, দড়ি লাগানো। প্রশ্ন উঠতে পারে, তান্ত্রিকের ডেরার চেয়ার কেন সিংহাসন হবে? ব্রহ্মানন্দ তো আর রাজা নয়। কথাটা হয়তো খুব মিথ্যে নয়, কিন্তু রাজার ক্ষমতা পেতে চেয়েছিল সে। আর তাই অপেক্ষায় ছিল তার সিংহাসন। নিয়মিত ঝাড়পোঁছ হত। সময় হলেই ব্যবহার হবে। তবে যাই হোক, সিংহাসনটার চেহারার মধ্যে আছে কাঠিন্য, তন্ত্র সাধনার মত।

রাজ দরবার

গুপী গাইন বাঘা বাইন ছবিতে আমলকি রাজার রাজদরবারটা বাদ দিলে প্রথম রাজদরবারটা অবশ্য শুণ্ডী রাজার। ধবধবে সাদা এই দরবারে প্রথমেই নজর কাড়া যে জিনিসটা সত্যজিৎ তৈরি করেছিলেন তা হল মেঝেতে একটা প্রজাপতির আলপনা। রঙিন নয়, সাদা কালো। কিন্তু এই আলপনাই ঝলমলে করে তুলেছে গোটা রাজদরবার। এখানে আলপনা আরও এঁকেছিলেন সত্যজিৎ। গাইয়ে বাজিয়ে বসার ফরাস। ফরাসটা পুরো দেখা যায়নি। দেখা গেছে ধারটুকু। ওইটুকুই ছিল আঁকা। শুণ্ডীরাজার সিংহাসন মেঝে থেকে দু ধাপ ওপরে। মন্ত্রীসভার সদস্যরা বসেছেন নিচে। সিংহাসনের

পাশেই রাজসিক একটা পেটা ঘন্টা। হাতির দুটো দাঁতের মাঝখানে ঝুলছে। এই ঘন্টাই পরে গুপী বাঘা ফিরে এলো ছবিতে সন্দীপ ব্যবহার করেছেন আনন্দপুর রাজার রাজদরবারে। এখনও যত্নে তোলা আছে এই মহামূল্যবান সম্পদটি। আবার বেজে ওঠবার অপেক্ষায়। হাল্লার রাজার রাজদরবারটা ঠিক উল্টোরকম। শুণ্ডী রাজারটা যেমন আলো ঝলমলে হাল্লার দরবারটা কিন্তু অন্ধকার অন্ধকার। রাজা নিষ্ঠুর, অত্যাচারী, যুদ্ধবাজ বলে? এই রাজদরবার পাথুরে। থামগুলোর চার মাথায় সিংহের মত ভয়ঙ্কর মুখ। থামগুলো যুদ্ধবাজ রাজামন্ত্রীর কুটিল মনের মত প্যাঁচালো। এই রাজদরবারে দেয়ালে ঝোলানো হয়েছে বড় বড় সিংওয়ালা হরিণের মাথা। এই ঘরের একদিকে খড় ভরা পুতুল। পুতুলের ইয়া গোঁফ। ঝুমকো ঘন্টা লাগানো। হাল্লারাজা এই পুতুলের ভুঁড়ি ফাঁসিয়ে বল্লম ছোঁড়া প্র্যাকটিস করেন। সেইদিক থেকে দেখতে গেলে অবশ্য হাল্লার আসল রাজা ছিলেন পাজি আর পেটুক মন্ত্রীটা। সেই তো রাজাকে ওষুধ খাইয়ে বশ করে রেখেছিল। সেই দিক থেকে বিচার করতে হলে তো হাল্লার সত্যিকারের রাজা ছিল ওই বিচ্ছিরি আর বেয়াদপ মন্ত্রীটাই। তাই ওর দরবারও রাজদরবার। রাজদরবার বটে হীরক রাজার। গোটা ঘরটা থেকে যেন হীরের দ্যুতি ঠিকরে বের হচ্ছে। আসলে হীরক রাজার দু-দুটো রাজদরবার। একটা খোলামেলা ঝলমলে। আর একটা

চাপা ফন্দি ফিকির করার মন্ত্রণালয়। প্রথম রাজদরবারটা জুড়ে হীরের নকশা। থামে, দেয়ালে, দরজায়, জানলার জাফরিতে পর্যন্ত হীরের নকশা। কোণ কাটা কাটা। দু নম্বর দরবারেও একই নকশা। সেখানে সিংহাসনের পেছনে তো রঙিন কাঁচের টুকরো বসানো বিরাট একটা হীরের ব্যাকগ্রাউন্ড। সেটার দুতিও দেয়াল জোড়া। সিংহাসনে কোণ কাটা কাটা নকশা। মেঝেটাও হীরের ঢঙে কোণ কাটা আলপনা। গুপী বাঘা ফিরে এল-তে সন্দীপ তৈরি করলেন আর একরকম চোখ ধাঁধানো রাজসভা। আনন্দপুর রাজার। আনন্দপুরের রাজা ভালো, এই রাজদরবারও মূলত সাদা। কিন্তু দরবার জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে সোনালি ফুল, পাশে নীল লাইন। সে মেঝেতে, দেয়ালে, স্কার্টিং-এ সর্বত্র। এমনকি জানলার জাফরিগুলোর প্যাটার্নও ফুলের মত। আনন্দপুরের রাজদরবার যেমন সোনালি ফুল দিয়ে চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছেন, শঙ্খপুরের রাজদরবার তেমনি সন্দীপ করলেন নীল শাঁখের নকশা দিয়ে। চোখ জুড়ানো রাজদরবার। এই দরবারের মেঝেতেও আলপনা। একদিকে সেই গুপী গাইন বাঘা বাইন ছবির গুপী বাঘার শোবার ঘরের ফোয়ারা। তান্ত্রিক ব্রহ্মানন্দর দরবারটা সাজানো তন্ত্র সাধনার সব নকশা দিয়ে। মাটির ওপর বসার আয়োজন। ব্যাকগ্রাউন্ডে গুরজারি ট্যাপেস্ট্রি।

হীরক রাজার রাজদরবার

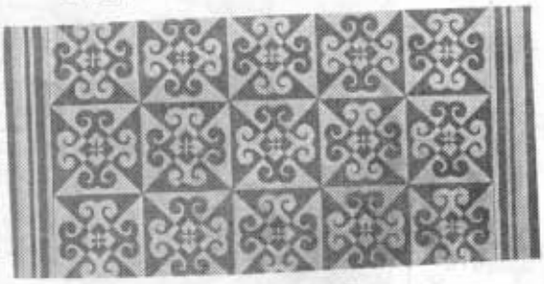

গুপী বাঘার শোবার ঘর

গুপী গাইন বাঘা বাইন ছবিতে গান শুনে ও খুশি হয়ে শুণ্ডীরাজা গুপী বাঘাকে বিশ্রামের জন্য যে শোবার ঘরটা দিলেন সেখানেই ছিল ফোয়ারা। ওই এক ফোয়ারাই ঘরের মেজাজ একেবারে খুশ করে দিয়েছিল। দেয়াল জুড়ে ময়ূরের নকশা। হীরক রাজ্যর দেশের প্রথমেই বিশ্রামে ক্লান্ত গুপী বাঘাকে যে শোবার ঘরে দেখা গেল তাতে ওই ফোয়ারাটা বদলে চমক দেওয়ার জন্য ছিল একটা বালি ঘড়ি। শিকলে ঝোলানো। গুপী গাইন বাঘা বাইন ছবিতে কিন্তু এই শিকলেই ঝুলছিল ম্যাকাও। হীরক রাজায় শোবার ঘরের দেওয়ালে ফুলের নকশা। মেঝেতে শতরঞ্চ স্টাইলে আলপনা। বড় বড় ফুলদানি। গুপী বাঘা ফিরে এলো-তে গুপী বাঘার শোবার ঘরে খাট দুটো দুর্দান্ত। মাথার দিকে একরকম নকশা, পায়ের দিকে অন্যরকম। তবে খাটের পায়া কীরকম হবে তাও সন্দীপ রায় এঁকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন শিল্প নির্দেশককে।

শুণ্ডীতে গুপী বাঘার শোয়ার ঘর

পতাকা

তিন ছবিতে হরেক রকম পতাকা। গুপী গাইন বাঘা বাইনে হাল্লা রাজার সেনারা যুদ্ধে গেল বাঘের মুখ আঁকা পতাকা উড়িয়ে। হীরকরাজার পতাকায় কিন্তু হীরের নকশা। আবার গুপী বাঘা ফিরেএলোতে আনন্দপুরের রাজ পতাকায় সোনালি ফুল।

হাল্লার রাজার পতাকা

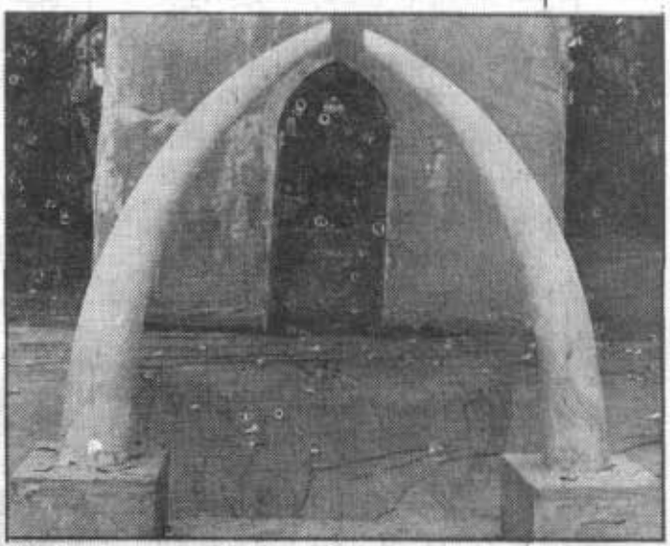

ঘণ্টা কৌলাবার জোড়া হাতির দাঁত। শুন্ডি ও আনন্দপুরের রাজসভায় ব্যবহৃত

ভূতের রাজার দাঁতের সমস্যা

রমেশ মুখোপাধ্যায়

'গুপী গাইন বাঘা বাইন'-এ ভূতের রাজার কোনও সমস্যা ছিল না। তিনি ছিলেন নিরুপদ্রব। কিন্তু এবার 'গুপী বাঘা ফিরে এলো'তে রাজা পড়লেন মহাবিপদে। ভূতের রাজার দাঁত পড়ে গেছে । ওপরের পাটির কয়ের দাঁত একটাও নেই। সন্দীপ রায়ের 'গুপী বাঘা ফিরে এলো'র 'ভূতের রাজা' চরিত্রটির জন্য আমাকে হঠাৎই নির্বাচন করা হল। কারণ পূর্ববর্তী রাজা হাঁদুদা অর্থাৎ প্রসাদ মুখোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই মারা গেছেন। একদিন সত্যজিৎ রায় নিজে বাড়িতে ডেকে আমাকে এই নির্বাচনের কথা জানালেন। এরপর সমস্যা হল, ভূতের রাজার নকল লম্বা দাঁত দুটো আটকানো হবে। কী করে? মেকআপম্যান অনন্ত দাস ভাবতে বসলেন। শেষে পরিচালকের নির্দেশে আমি গেলাম রাসবিহারী অ্যাভিনিউতে একজন ডেন্টিস্টের কাছে। সেখানে আমার দাঁত বাঁধানো হল। তারপর সেই নকল দাঁতের সঙ্গে অনন্ত দাস জুড়ে দিলেন আরও দুটো নকল ভূতের দাঁত। আর, তারপর যা যা ঘটেছে, সে তো আপনারা সবাই দেখেছেন। শুটিংয়ের আগে একদিন ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে ডেকে মাথার মাপ, চুলের মাপ ইত্যাদি নেওয়া হল। তারপর শুটিংয়ের দিন আমাকে বেশ সকাল সকাল স্টুডিওতে যেতে বলা হল। গেলাম। অনন্ত মেকআপ শুরু করলেন। প্রথমে মুখ, ঘাড়, গলা বেয়ে বুক পর্যন্ত সাদা রং বোলানো হল। কান দুটাকে স্যামুয়েল লেদার ও মোটা কাগজ দিয়ে বড় করা হল। তারপর সাদা ও সোনালী রঙের রাংতা কেটে কেটে সারা মুখে, ঘাড়ে, গলায়, বুকে বসানো হল। সবশেষে একটা কালো মুকুট পরানো হল। মুকুট বলতে, বিয়ের আসরে কনেকে যে শোলার মুকুট পরানো হয়, সেটাকেই অনন্ত কালো রঙ করে নিয়েছিলেন। এইসব করতে লেগে গেল ঝাড়া দু'ঘণ্টা। আমি হয়ে উঠলাম 'ভূতের রাজা'। তবে এই মেকআপ যন্ত্রণা একদিনে শেষ হয়নি। প্রথমদিন শুটিং করার পরে জানা গেল, গোটা দৃশ্যটা রি-শ্যুট করতে হবে। টেকনিক্যাল গোলমাল দেখা দিয়েছে। বাবু, মানে সন্দীপ বলল, 'রমেশদা! আলোর সমস্যা হয়েছে। আপনাকে কিন্তু আর একদিন কষ্ট দেব।' আমি বললাম, নিশ্চয়ই। তারপর একদিন আবার আমি গেলাম। রবি, তপেন এল। শুটিং হল। সত্যজিৎ রায় হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার আগে একদিন বাড়িতে দেখা করতে গেলাম। মানিকদা আমাকে দেখে একেবারে হই হই করে উঠলেন, 'তোমার ভূত হিট্। ভূত আসছে হাততালি। যাচ্ছে হাততালি।' ভূতের রাজার এই সাফল্যে কারণ বোধহয় 'গুপী গাইন বাঘা বাইন'-এ রাজা শুধু 'জবর জবর তিন বর' ছাড়া আর বিশেষ কিছুই দেননি, কিন্তু 'গুপী বাঘা ফিরে এলো'তে ভূতের রাজা নানারকম নীতিকতা শুনিয়েছেন। এগুলোই ছোট-বড় সব শ্রেণীর দর্শককে টেনেছে বলে মনে হয়। সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে এর আগে 'অশনি সঙ্কেত' ও 'সুকুমার রায়' তথ্যচিত্রের 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' অংশে কাজ করেছি। বাবুর সঙ্গে এটাই কিন্তু আমার প্রথম কাজ। দেখলাম, বাবার মত ছেলেও শিল্পীদের কাজের স্বাধীনতা দেন খুব বেশি। প্রথমদিনের শুটিংয়ে ফ্লোরে ঢুকে দেখলাম, ভূতের রাজার সেট বলতে তেমন কিছুই নেই। একটা কালো পর্দা টাঙানো হয়েছে। তার সামনে কাঠের উঁচু প্ল্যাটফর্মের সন্দীপ আমাকে সেই প্ল্যাটফর্মের ওপর উঠে পা গুটিয়ে বসতে বলল। বুঝিয়ে দিল আমাকে ঠিক কী কী করতে হবে। আর, তারপর শুরু হল সেই গান। তবে 'গুপী বাঘা ফিরে এলো'তে ভূতের রাজার যে কণ্ঠস্বর আপনারা শুনেছেন, সেটা আমার নয়। সন্দীপের। গোটা গানটা সন্দীপ রায়ই গেয়েছে। আমি শুধুই ঠোঁট মিলিয়েছি। এমনকি কণ্ঠস্বরের যে মেটালিক সাউন্ড সেটাও সন্দীপেরই আবিষ্কার।

ভূতের রাজার উপদেশ

গুপী বাঘা ফিরে এলো ছবিতে ভূতের রাজা ফিরে এসেছেন দুবার। একবার নতুন গাঁয়ের বাঁশবনে, আরেকবার গুপী বাঘার স্বপ্নে। এবারের ছবিতে জ্ঞানী ভূতের রাজা শুধু উপদেশই দিয়েছেন। ভূতের রাজার মূল ডায়ালগের অংশ প্রকাশিত হল।

*

তবে এটা বলে রাখি শুনে রাখ জেনে
রাখ মনে রাখ – গ্রহ তারা ভালো নয়
দিন কাল ভালো নয় ভালো নয়
সোজা পথে থাকা চাই সোজা পথ
সোজা পথ গুপী ভালো বাঘা
ভালো থাকা চাই থাকা চাই থাকা
চাই আমি আসি আমি আসি
আমি আসি....

*

তোরা বাঁকা পথে কেন যাস কেন যাস
কেন যাস আমি মানা করি তাও যাস
তাও যাস তাও যাস – আমি মনে বড় ব্যথা
পাই ব্যথা পাই ব্যথা পাই!

*

কেন কেন কেন কেন তোরা যদি দুই
কুড়ি হোস তাতে ক্ষতি কীবা ক্ষতি
কীবা ক্ষতি কীবা – ক্রমে ক্রমে
দুই কুড়ি তিন কুড়ি চার কুড়ি এই
ভাবে সব লোকে বড় হয় বুড়ো হয় ক্ষতি
নাই ক্ষতি নাই – মন যদি তাজা
থাকে জ্ঞান যদি বেড়ে থাকে মান যদি
বেড়ে থাকে সেই ভালো সেই ভালো
সেই চাই সেই চাই সেই চাই –

*

গান গেয়ে মাপ চাস মাপ চাস মাপ
চাস মাপ চাস সব পাপ ধুয়ে যাবে
সব কালি মুছে যাবে মুছে যাবে –

গুপী বাঘার গানের খাতা

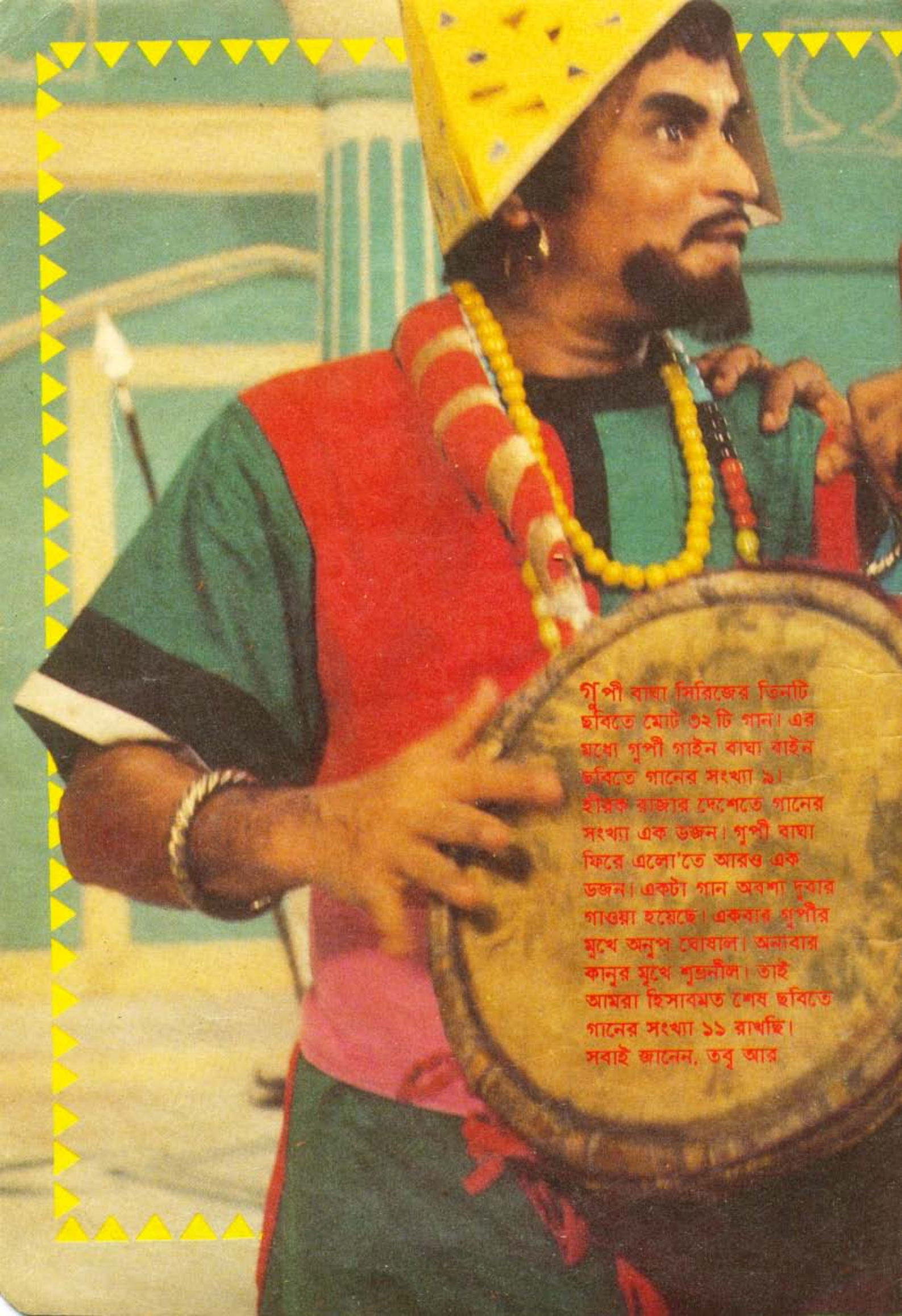

গুপী বাঘা সিরিজের তিনটি ছবিতে মোট ৩২ টি গান। এর মধ্যে গুপী গাইন বাঘা বাইন ছবিতে গানের সংখ্যা ৯। হীরক রাজার দেশেতে গানের সংখ্যা এক ডজন। গুপী বাঘা ফিরে এলো'তে আরও এক ডজন। একটা গান অবশ্য দুবার গাওয়া হয়েছে। একবার গুপীর মুখে অনুপ ঘোষাল। অন্যবার কানুর মুখে শুভনীল। তাই আমরা হিসাবমত শেষ ছবিতে গানের সংখ্যা ১১ রাখছি। সবাই জানেন, তবু আর

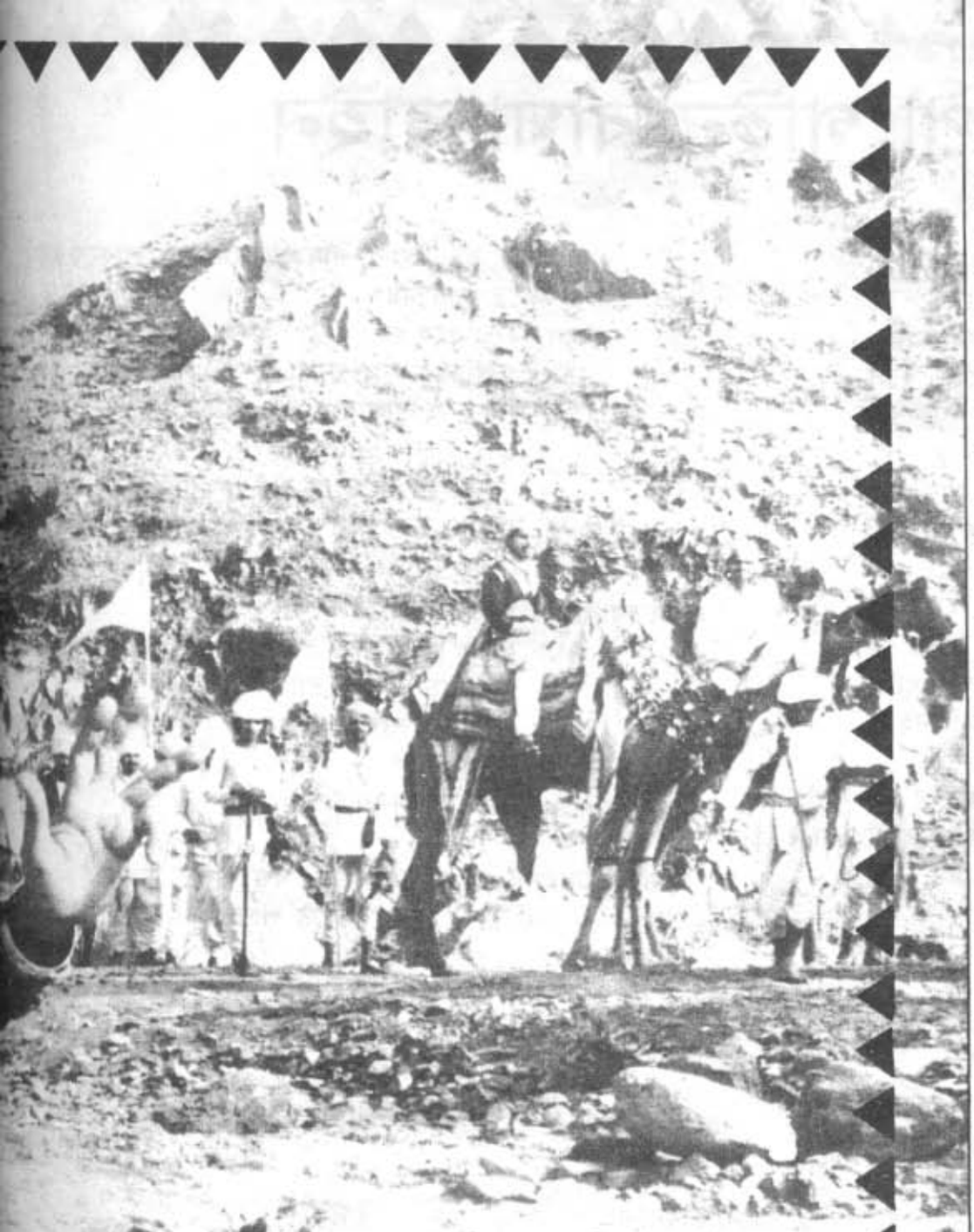

একবার জানিয়ে রাখা ভাল, গুপীর সবকটি গানই গেয়েছেন অনুপ ঘোষাল। গানের মধ্যে যেখানে বাঘা ফোড়ন কেটেছে, সেখানে গলা রবি ঘোষের। গুপী গ্যাইন বাঘা বাইন ছবিতে 'আছে যত সব আমীর ও ওমরা' গানটি গেয়েছিলেন স্বনামধন্য অভিনেতা কাম্মু মুখার্জি। অনেকেরই ধারণা গানটি গেয়েছিলেন হাল্লার রাজা স্বয়ং অর্থাৎ সন্তোষ দত্ত। তা ঠিক নয়। তবে গানের সঙ্গে গলা মিলিয়েছিল হাল্লার ষড়যন্ত্রী মন্ত্রীমশাই। সেখানে গলা অবশ্যই জহর রায়ের। হীরক রাজার দেশে রাজসভায় চরণদাসের গানটি গেয়েছিলেন অমর পাল। আর প্রথম ছবিতে ভূতের রাজার সেই ভূতুড়ে গানটি কে গেয়েছিলেন, সে তো সকলেরই জানা। স্বয়ং সত্যজিৎ রায়। আমরা ভেবেছিলাম তিন নম্বর গুপী বাঘা ছবির ভূতের রাজার 'গানটি'ও এই পাতায় রাখব। পরিচালক সন্দীপ রায় সব শুনে বললেন, তা কেন হবে? ওটা তো গানই নয়। অতএব ৩২টা গান নিয়েই তৈরি হল গুপী বাঘার গানের খাতা। সব গানই লিখেছেন, সুর দিয়েছেন সত্যজিৎ রায়। কিন্তু দুঃখের কথা হল বাজারে যেসব গানের ক্যাসেট পাওয়া যায়, তাতে অনেকগুলো গানই নেই। আমরা এইচ. এম. ভি. কোম্পানিকে অনুরোধ করছি তিনটি ছবির সব গান দিয়ে নতুন করে ক্যাসেট বের করা হোক।

গুপী গাইন বাঘা বাইন

১

ভূতের রাজা: গুপী বাঘা গুপী বাঘা
ভয় নেই, ভয় নেই
কাছে আয় কাছে আয়
তোরা বড় ভালো ছেলে
কাছে আয়।

গুপী: আপনি আমাদের চেনেন?

বাঘা: আপনি আমাদের নাম জানেন?

ভূতের রাজা: নাম জানি, ধাম জানি।
সব জানি।
রাজা দিল দূর ক'রে
ঠাঁই নেই, ঠাঁই নেই
কোথা যাবি, কিবা খাবি
জানা নেই জানা নেই
জানা নেই –

গুপী: সত্যি রাজামশাই। আমাদের বড় মুশকিল।

বাঘা: কী যে করব কিছুই বুঝতে পারছি না।

ভূতের রাজা: আমি আছি, আমি আছি।
ভূতো রাজা খুশি হলে
বর দিই খুশি হলে বর দিই।
তিন বর –

গুপী-বাঘা: তিন বর!

ভূতের রাজা: শুধু তিন শুধু তিন।
ভেবে টেবে বল তোরা
কোন বর, কোন বর চাস
বল।

গুপী: রাজামশাই আমাদের যেন খাওয়া-পরার কোনো ভাবনা না থাকে।

গুপী: রাজামশাই, যদি আমরা গান বাজনা ক'রে লোককে এক খুশি করতে পারতাম!

ভূতের রাজা: হবে হবে হবে হবে
গান হবে ঢোল হবে
সুর হবে তাল হবে লয় হবে
লোকে শুনে ভ্যাবাচ্যাকা
স্থির হয়ে থেমে যাবে
থেমে যাবে থেমে যাবে
থেমে যাবে –

ভূতের রাজা: খাওয়া পরা বেশ বেশ!
খেতে চেয়ে হাত তালি,
জামা চেয়ে হাত তালি।
এর হাতে ওর হাতে
মিলে তালি –
আর কোন বর চাস
বল –

বাঘা: আমাদের খুব দেশ বেড়াবার বড় শখ রাজামশাই।

গুপী: যদি একটু ঘুরে টুরে বেড়াতে পারতাম!

ভূতের রাজা: দেশ দেখা, দেশ দেখা বেশ বেশ বেশ বেশ
জুতো জোড়া পায়ে পরে
কোথা যাবি নাম ক'রে
এর হাতে ওর হাতে
তালি দিবি তালি দিবি।

২

দ্যাখরে নয়ন মেলে
জগতের বাহার
দিনের আলোয় কাটে অন্ধকার –
আহা মরি কী বাহার!
দ্যাখরে চারিপাশে
দ্যাখরে ঘাসে ঘাসে
দ্যাখরে নীলাকাশে
আহা মরি কী বাহার!
দিনের আলোয় কাটে অন্ধকার।
দ্যাখরে নদীজলে
দ্যাখরে বনতলে
দ্যাখরে ফুলেফলে
আহা মরি কী বাহার!
দিনের আলোয় কাটে অন্ধকার! *

৩

ভূতের রাজা দিল বর,
জবর জবর তিন বর।
যা চাই পরতে খাইতে পারি,
যেখানে খুশি যাইতে পারি।
সানি ধাপা মাগা রেসা গাইতে পারি,
সারে গামা পাধা নিসা গাইতে পারি।
কেমন সুন্দর!
ভূতের রাজা দিল বর।

আহা ভূত	বাহা ভূত
কিবা ভূত	কিম্ভূত
বাবা ভূত	ছানা ভূত
খোঁড়া ভূত	কানা ভূত
কাঁচা ভূত	পাকা ভূত
সোজা ভূত	বাঁকা ভূত
রোগা ভূত	মোটা ভূত
আধা ভূত	গোটা ভূত

আরো হাজার ভূতের রাজার দয়া
মোদেরি উপর
ভূতের রাজা দিল বর।
তাইরে নাইরে নাইরে
আর ভাবনা কিছু নাইরে
তাক ধিন্ ধিন্না ধিন্‌তা
আর নাইকো মোদের চিন্তা
কেবল পেটে বড় ভুখ
না খেলে নাই কোন সুখ।
আয়রে তবে খাওয়া যাক্
মন্ডা মিঠাই চাওয়া যাক্
কোর্মা কালিয়া পোলাও জল্‌দি লাও
জল্‌দি লাও।

৪

মোহারাজ! তোমারে সেলাম,
সেলাম, সেলাম,
মোরা বাংলাদেশের থেকে এলাম।
মোরা সাদা সিধা মাটির মানুষ দেশে দেশে যাই,
মোদের নিজের ভাষা ভিন্ন আর ভাষা জানা নাই,
মহারাজা, রাজামশাই।
তবে জানা আছে ভাষা অন্য
তোমাদের শুনাইয়ে ধন্য
এসেছি তাহারি জন্য, রাজা!
মহারাজ!
মোরা সেই ভাষাতেই করি গান
রাজা শোন ভরে মন প্রাণ।
এ যে সুরেরই ভাষা, ছন্দেরই ভাষা
তালেরই ভাষা, আনন্দেরই ভাষা
ভাষা এমন কথা বলে বোঝেরে সকলে –
রাজা উচা-নিচা ছোট বড় সমান
মোরা এই ভাষাতেই করি গান
মহারাজা তোমারে সেলাম।

* 'দ্যাখরে নয়ন মেলে' গানটি ছবিতে ব্যবহার করা হয়েছিল কেবল প্রথম স্তবকটি। পাঠকদের সংগ্রহের জন্য পুরো গানের কথাই প্রকাশ করা হল।

৫

ও রাজা শোন, শোন, শোন,
শুণ্ডী রাজা শোন।
মোরা বড় খুশি ভারী খুশি বেজায় খুশি
তোমাদের দেশে এসে।

এ দেশের নাই তুলনা
এদেশের মাটিতে যে ফলে সোনা
এ দেশের কত বাহার কত যে রূপ কত যে গুণ
যায় না গোণা
মোরা তাই বড় খুশি এমন দেশে তোমার দেশে
শুণ্ডী দেশে এসে।
এ দেশের লোকের মুখে নাইরে ভাষা
তারা তাও কাছে এসে হেসে হেসে জন্মায় কতো
ভালোবাসা।

এ দেশের রাজামশাই
"দেখো তার" জাঁকজমকের নাইকো বালাই,
এ রাজা মোদের দেখো ঘর দিয়েছে, ঠাঁই দিয়েছে
যেমনি চাই তাই দিয়েছে
এমন দেশে –
রাজা গো তাইত মোরা এত খুশি
এমন দেশে আজব দেশে শুণ্ডী দেশে এসে। *

৬

ওরে বাঘারে বাঘারে
ওরে গুপীরে –
এবার ভেগে পড়ি চুপি চুপিরে।
এবার কেটে পড়ি – সরে পড়ি
ভেগে পড়ি চুপি চুপিরে।
দেখে বিচিত্র এ কাণ্ড কারখানা
এদের রকম সকম গিয়েছে জানা
বাবারে! বাবারে!
শুনে হাল্লা রাজার হাঁকা হাঁকি
উড়ে গেল প্রাণের পাখী –
মুণ্ডু খানা যেতে বাকী –
মুণ্ডু গেলে খাবটা কী-
মুণ্ডু ছাড়া বাঁচব নাকি – বাবারে – বাবারে,
বাবারে, বাবারে, বাবারে, বাবারে!
চাচারে নিজেরে বাঁচারে এবারে।
বাবারে, পালারে পালারে।

* সভা-গায়ক হবার পর শুণ্ডী রাজার দরবারে হাততালি দিতে দিতে এই গানটি গেয়েছিল গুপী। ১৯৬৯-এ প্রথম মুক্তি পাবার সময় গানটি ছিল। পরে ছবির সময় সংক্ষেপ করার জন্যে গানটি বাদ যায়। রেকর্ড বা ক্যাসেটে এই গানটি নেই।

৭

ও মন্ত্রী মশাই —
আরে থাম্ থাম্ থাম্
থেমে থাক্।
ও মন্ত্রী মশাই
ষড়যন্ত্রী মশাই থেমে থাক্।
যত চালাকি তোমার
জানতে নাইকো বাকি আর
যত কেরদানি শয়তানি সবই ফাঁক
চীচিং ফাঁক থেমে থাক্!
ও মন্ত্রী মশাই; ষড়যন্ত্রী মশাই।
শুধু দেখেছ ঘু ঘুটি তাই এত ভুরু কুটি
পড়লে ফাঁদেতে চুপসিয়ে যাবে যাক
জয় ঢাক।
ও মন্ত্রীমশাই থেমে থাক।
ও মন্ত্রী মশাই সাবধানে থেকো ভাই
গা গা মাগা রেসা
ধেরে কেটে তাক্।

৮

আছো হেথা যত
আমির ও ওম্‌রা

[গাইছ না কেন?]
আছো হেথা যত
আমির ও ওম্‌রা।

আর যত ব্যাটা
হোমরা চোমরা।

আর যত হুঁ হুঁ
হোমরা চোমরা।

বার্তা ভীষণ,
শোন হে তোমরা

শোনো হে, শোনো হে,
শোন হে তোমরা।

হাল্লা চলেছে যুদ্ধে।
হাল্লা চলেছে যুদ্ধে!

[গাও!]
হাল্লা চলেছে যুদ্ধে!
হাল্লা চলেছে যুদ্ধে!
হাল্লা হাল্লা হাল্লা!
শুণ্ডীর দেবো পিন্ডি চটকে।
শুণ্ডীর দিও পিন্ডি চটকে।
শত্রু নাশিব স্কন্ধ মটকে!
শত্রু নাশিও স্কন্ধ মটকে।
নিস্তারও নাহি কাহারাও সটকে
নিস্তারও নাহি
আমারও সটকে।
হাল্লা চলেছে যুদ্ধে!
হাল্লা চলেছে যুদ্ধে!
যুদ্ধে! যুদ্ধে! যুদ্ধে!

৯

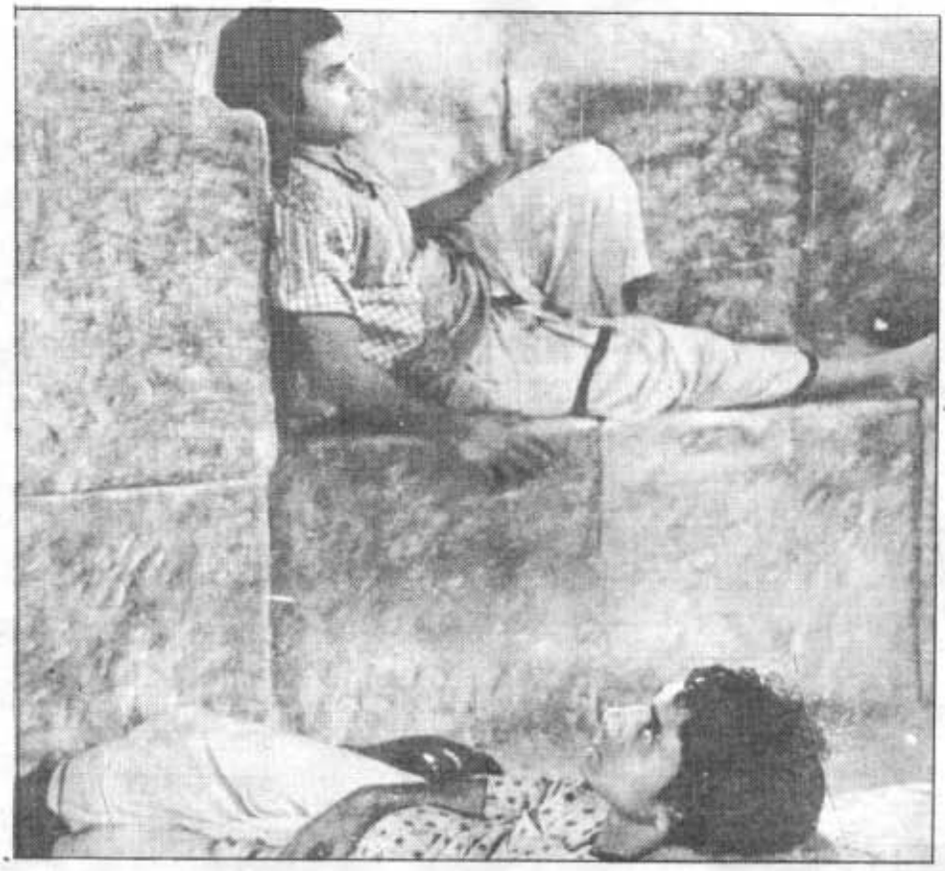

এক যে ছিল রাজা তার ভারী দুখ।
দ্যাখ রাজা কাঁদে রাজা আহারে রাজা
বেচারা রাজার ভারী দুখ।
দুঃখ কিসে হয়।
অভাগার অভাবে জেনো শুধু নয়।
যার ভান্ডারে রাশি রাশি
সোনা দানা ঠাসাঠাসি তারও ভয়
জেনো সেও সুখী নয়।
দুঃখ যাবে কী।
বিরস বদনে রাজা ভাবে কি।
বলি, যারে তারে দিতে শাস্তি
রাজা কখনো সোয়াস্তি পাবে কি।
দুঃখ যাবে কি!
দুঃখ কিসে যায়।
প্রাসাদেতে বন্দী রওয়া বড় দায়।
একবার ত্যাজিয়ে সোনার গদি
রাজা মাঠে নেমে যদি হাওয়া খায়
তবে রাজা শান্তি পায়।

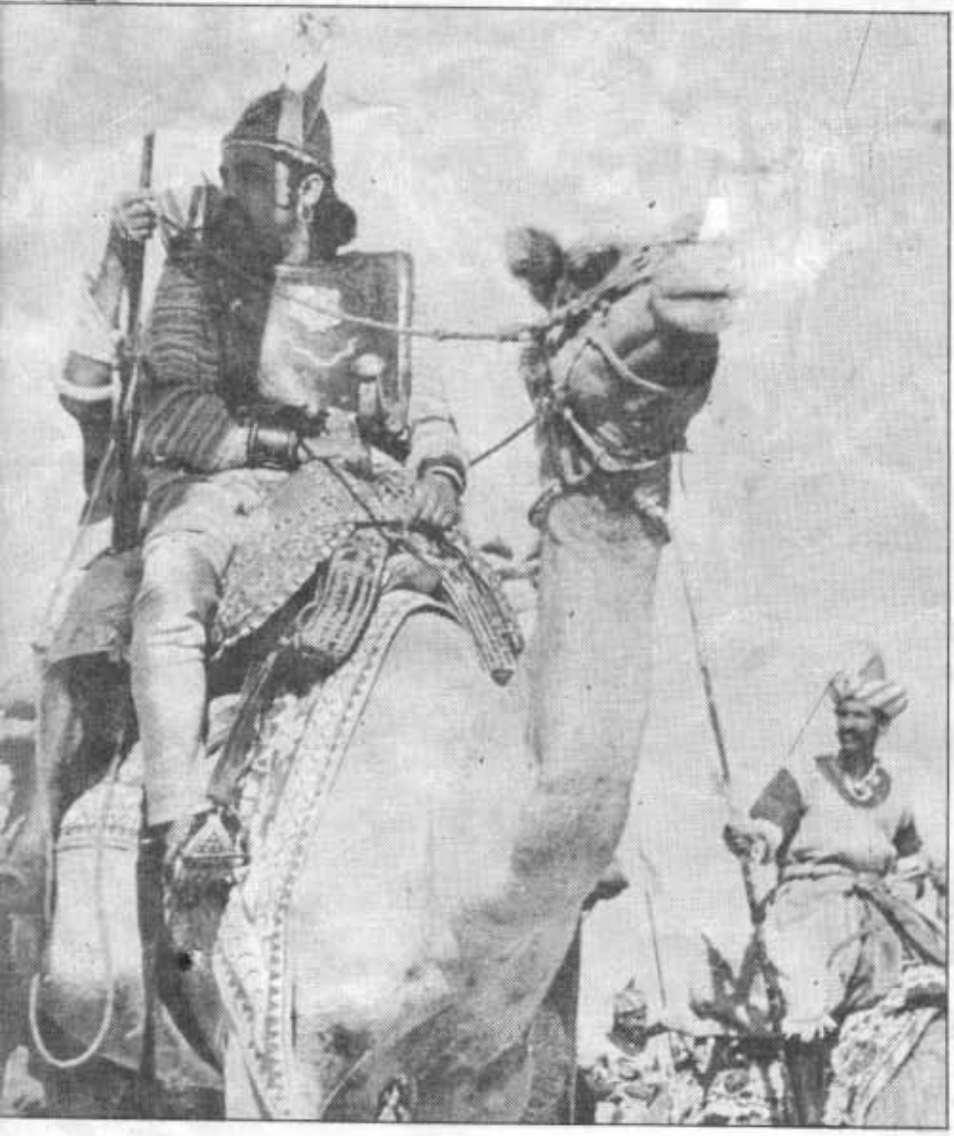

১০

ওরে বাবা দেখ চেয়ে কত সেনা চলেছে সমরে।
হাজারে হাজারে হাতিয়ারে, কাটাকুটি করে।
আহারে, আহারে।
পেটে খেলে পিঠে সয়,
এতো কভু মিছে নয় –
সেনা দেখে লাগে ভয়।
আধ পেটা খেয়ে বুঝি মরে।
যত ব্যাটা চলেছে সমরে।
ওরে হাল্লা রাজার সেনা –
তোরা যুদ্ধ করে করবি কী তা বল।
মিথ্যে অস্ত্র ধরে,
প্রাণটা কেন যায় বেঘোরে।
রাজ্যে রাজ্যে পরস্পরে দন্দ্বে অমঙ্গল
তোরা যুদ্ধ করে করবি কী তা বল।
রাজা করেন তম্বি তম্বা
মন্ত্রীমশাই কিসে কম্বা
প্রজা পেয়ে অষ্টরম্ভা হল হীন বল –
তোরা যুদ্ধ করে করবি কী তা বল।
আয়, আয়, আয়রে আয়।
মন্ডা মিঠাই হাঁড়ি হাঁড়ি
কাঁচাগোল্লা কাঁড়ি কাঁড়ি
মিহিদানা পুলি পিঠে ভিজে গজা মিঠে মিঠে
আর কত আছে মিষ্টি দেখো দেখো করে বৃষ্টি
রসবৃষ্টি, মধুবৃষ্টি।

হীরক রাজার দেশে

১

গুপী মোরা দুজনায় রাজার জামাই।
মোরা খাই দাই ঘুরি ফিরি
আহা কি মোদের ছিরি
মোরা দিনে করি বাবুগিরি
রাতে আয়েশে ঘুমাই–
মোরা দুজনায় রাজার জামাই।
মোদের ঘরে আছে দুই রাজকন্যা
রূপে গুণে জেনো সাধারণ না।
আর আছে পোলাপান–
বাঘা একখান–
গুপী একখান–
বাঘা কচি তারা কথা ফোটে নাই।
গুপী রাজা যিনি শুণ্ডীর রাজ্যে
(তিনি) সদাই মগন রাজকার্যে
এই রাজা বড় সোজা
সুখে আছে যত প্রজা।
এ রাজার মতো রাজা নাই–
বাঘা শ্বশুরমশাই–
গুপী মোরা ত্যানার জামাই
মোরা দুজনায় রাজার জামাই।
এইবারে শোনো–
মোদের কেমনে হয়েছে এই হাল–
মোদের না ছিল চুলা না ছিল চাল–
শেষে দিলেন ভূতের রাজা
তিন বর তাজা তাজা
সেই বরে ফিরেছে কপাল
সেই বরে এত রোশনাই।
সেই বরেতেই মোরা
দুজনায় রাজার জামাই।

২

গুপী না না – আর বিলম্ব নয়, আর বিলম্ব নয়!
এখনো মোদের শরীরে রক্ত
রয়েছে গরম মেটেনি শখ তো
আছে যত হাড় সবই ত শক্ত
এখনো ধকল সয়।
এখনো আছে সময়, এখনো আছে সময়–
আর বিলম্ব না না, আর বিলম্ব নয়।
গুপী দুনিয়ায় কত আছে দেখবার,
কত কি জানার কত কি শেখার।
বাঘা সবই ত বাকি, কিছুই দেখা হয় নাই।
গুপী ঘরে কেন বসে রয়েছি বেকার
আর কি সহ্য হয়?
বাঘা অসহ্য!
গুপী এখনো আছে সময়, এখনো আছে সময়,
আর বিলম্ব না না, আর বিলম্ব নয়।
বাঘা চলহে, কোথাও ঘুরে আসি গিয়ে।
গুপী (সুর ক'রে) চল যাই ঘুরে আসি প্রাণ ভরে
বনেতে পাহাড়ে মরুপ্রান্তরে।

৩

চরণ আমি কতই রঙ্গ দেখি দুনিয়ায়
ও ভাইরে!
আমি যেই দিকেতে চাই
দেখে অবাক বনে যাই
আমি অর্থ কোথাও খুঁজে নাহি পাইরে,
ভাইরে–
আমি কতই রঙ্গ দেখি দুনিয়ায়।
দেখ ভালো জনে রইল ভাঙা ঘরে
মন্দ যে সে সিংহাসনে চড়ে–

সোনার ফসল ফলায় যে তার
দুই বেলা জোটেনা আহার
হীরার খনির মজুর হয়ে
কানাকড়ি নাই – ওরে নাইরে, ভাইরে!
আমি কতই রঙ্গ দেখি দুনিয়ায়।

৪

গৃপী আহা কী আনন্দ আকাশে বাতাসে
শাখে শাখে
পাখি ডাকে
কত শোভা চারিপাশে।
আজকে মোদের বড়ই সুখের দিন
আজ ঘরের বাঁধন ছেড়ে মোরা হয়েছি স্বাধীন
আজ আবার মোরা ভবঘুরে
মুলুক ছেড়ে যাব দূরে
ভরব ভুবন গানের সুরে
পুরান দিনের কথা আসে
মনে আসে
ফিরে আসে–
আহা কী আনন্দ আকাশে বাতাসে।

৫

আহা সাগরে দেখ চেয়ে
ঢেউয়ের পরেতে ঢেউ আসে ধেয়ে
দেখ চেয়ে।
দেখ আকাশে জলেতে মিশে হল একাকার
কী বাহার কী বাহার।

৬

এ যে দৃশ্য দেখি অন্য
এ যে বন্য, এ অরণ্য।
হেথা দিনেতে অন্ধকার
হেথা নিঃঝুম চারিধার
হেথা ঊর্ধ্বে উঁচায়ে মাথা দিল ঘুম
যত আদিম মহদ্রুম।

৭

এবারে দেখ গর্বিত বীর
চির তুষারমণ্ডিত শির।
অতি ধীর গুরুগম্ভীর।
কত যোগী কত ঋষি
কত সাধক পূজিত শাশ্বত অদ্রি প্রবীণ
বিশ্বজনের বিস্ময়
দুর্লঙ্ঘ্য দুর্জয়
হিমালয়, হিমালয়!

৮

গুপী

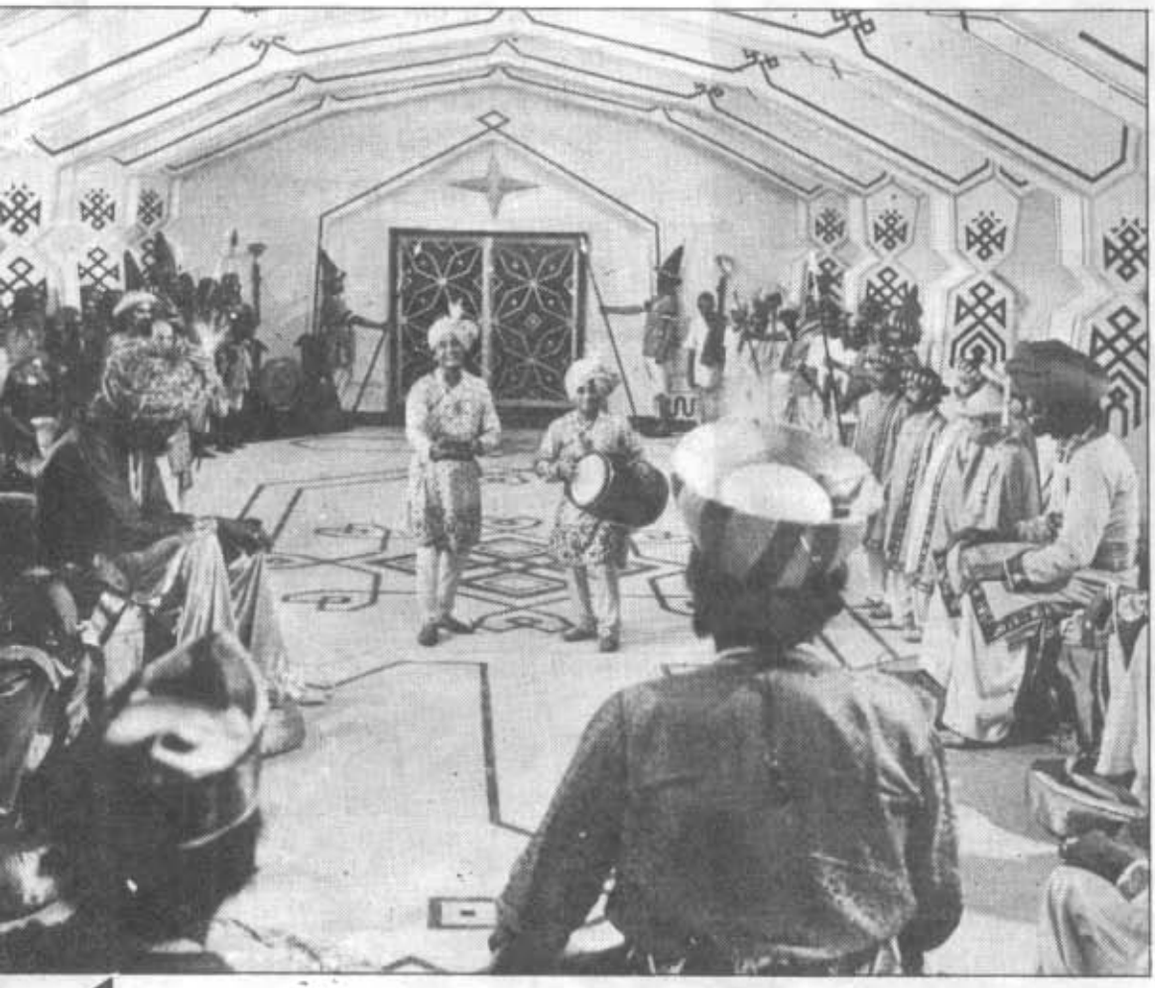

এসে হীরক দেশে
দেখে হীরের চমক
এত খাতির পেয়ে
দেখে রাজার জমক
মোদের মন ভরে গেছে খুশিতে
মোরা সেই কথাই জানাই।
রাজা এতই রসিক
রাজা এতই দরাজ
রাজা এতই মিশুক
এত চিকণ মেজাজ
মোদের প্রাণ ভরে গেছে তাই
মোরা সেই কথাই জানাই।
বল হীরক রাজার জয়
বল এমন রাজা কজন রাজা হয়
কত দেশে দেশে ঘুরে শেষে
মন বলে হীরকে এসে
এমন রাজা কোনো দেশে নাই –
মোরা সেই কথা জানাই
মোদের গানে।

৯

গুপী ধোরনাকো ধোরনাকো ধোরনাকো ধোরনাকো
ধোরনাকো সান্ত্রীমশাই!
হাত কেন বাড়াও ভাই?
নোড়নাকো নোড়নাকো নোড়নাকো নোড়নাকো
ওইখানে দাঁড়াও ভাই
আর বেশি সময় নাই।
তুমি এইদিকে চেয়ে থেক না
দেখ না, দেখ না –
এখন মোরা নই রাজার জামাই
মোরা করব এখন ডাকাতি
রাতারাতি –
দেখে দুঃখ কেন পাও কওত?
তুমি ওই দিকে ঘুরে রওত –
আহা ঘোরনাকো ঘোরনাকো ঘোরনাকো ঘোরনাকো
ওই দিকে ঘোর ভাই –
সান্ত্রীমশাই, সান্ত্রীমশাই!

১০

গুপী সা রে গা–
সা গা গা–
সা গা মা গা–

তোমার পায়ে পড়ি বাঘমামা
কোরনাকো রাগ, মামা–
তুমি যে এ ঘরে কে তা জানত?
এ যে বিনা মেঘে পড়ে বাজ
কেঁচে বুঝি গেল কাজ
দয়া করে থাকো হোয়ে শান্ত!

যদি ঘাড়ে এসে পড়ে থাবা
কী হবে তা জানি বাবা
হারা যাবে তাজা দুটি প্রাণ ত!
তুমি যে এ ঘরে কে তা জানত?

বাঘাদা, বলি হীরা-নিলে কত শুনি?
বাঘা সময় কি আছে যে গুনি?
গুপী তবু, কত শুনি?
বাঘা নিয়েছি যথেষ্ট।
গুপী তবে আর নিয়ে কাম নাই
এবারে চল পালাই
বড় কষ্টে পাওয়া গেছে কেষ্ট!
যথেষ্ট যথেষ্ট...

১১

গুপী নহি যন্ত্র, নহি যন্ত্র, আমি প্রাণী!
- আমি জানি, আমি জানি, আমি জানি
হীরক রাজার শয়তানি।
রাজা দুষ্ট, রাজা মন্দ,
রাজা ধূর্ত, রাজা ভণ্ড
রাজা অনাচারের সীমা ছেড়ে
অভাগারে ভাতে মেরে
আনে দেশে ঘোর অমঙ্গল।

রাজা রাখল তাদের চেপে
যারা উঠলে পরে খেপে
রাজার আসন খানা করবে টলোমল–
রাজা ঠিক কিনা, ঠিক কিনা তুই বল।
রাজার শক্ত হাতে শিক্ষা পেলে
শান্তি হবে ঠিক–
রাজা ধিক্, ধিক্, ধিক্
রাজা ধিক্!

এইবারে রাজা শোনো–
জেনো নিস্তার নেই কোনো
এসেছে তোমার যম
তুমি রাজা অক্ষম
মরণের দিন তুমি গোনো।
রাজা ধিক্ ধিক্ ধিক্
রাজা ধিক্!

১২

গুপী মোরা গুপী বাঘা দুজন ভায়রা ভাই
মোদের আর কোনো কাজ নাই–
মোরা ভূতের রাজার বরের জোরে
পরের ভূত ছাড়াই।
শোনো কারেও যদি ভূতে ধরে
মোদের যেন খবর করে
শুণ্ডী দেশের রাজপ্রাসাদে
মোদের ঠিকানায়–
মোরা আসব দুজনায়
ফিরে আসব দুজনায়
আবার আসব দুজনায়!

গুপী বাঘা ফিরে এলো

১

কত কাল পরে মোরা এসেছি আবার!
যত ভাইবোনেরা চলো মোদের সাথে
তেপান্তরের পার –
ডাক পড়েছে দূর দেশে যাবার –
কত কাল পরে মোরা এসেছি আবার!
মোদের শ্বশুরমশাই বনবাসী –
তাঁর বয়স হল অষ্টআশি –
তাই মোরাই এখন রাজা
গুপী-বাঘা রাজা
শুণ্ডীদেশের রাজা!
তবে রাজা হওয়ার ব্যাপারটাকি
এই বেলাতে বলে রাখি –
নেইকো এতে ঢাকাঢাকি কোনো –
এবার শোনো –
মনটা যাদের ঘোরে মাঠে ঘাটে
সিংহাসনে বসে বসে
সময় তাদের কেমন করে কাটে?
দূর ছাই! দূর ছাই!
এইবারে সব ছেড়েছুড়ে
বেরিয়ে পড়া চাই!
মন্ত্রী করুন প্রজা পালন –
সরে পড়ি মোরা দুজন –
বন্দী হয়ে মনটা হল ভার,
দিন কাটেনা আর!
কত কাল পরে মোরা এসেছি আবার!
মোদের আরও বলা বাকি –
কোথায় যাব যাবার কারণটাকি –
এখান থেকে অনেক দূরে
পশ্চিমে আনন্দপুরে –
রাজসভাতে যাদুর হবে বাজি,
মোদের ডাক পড়েছে তাই,
মোরা এক কথাতেই রাজি –
মোরা ভূতের বরে ভেল্‌কি করি,
সবাই বলে আহামরি
জেনো সেটা বড়ই মজাদার –
বড়ই মজাদার!
কত কাল পরে মোরা এলাম আবার –
মোরা এলাম আবার!

২

অ্যাদ্দিনে দুইজনে ঘর ছেড়ে হয়েছি বার –
তাইতো মোরা ভাবনা ভুলে, হালকা মনে,
গান করি আবার!
মোরা মানিকজোড় –
গুপী-বাঘা মোরা মানিকজোড়!
মোদের মতন জুটি খুঁজে
পাবেনাকো আর!
মোরা যাই করি তাই করি জোটে
সেইভাবে ভাব জমে ওঠে –
বিশটা বছর কেটে গেল
কেমন চমৎকার!
সা গা রে সা নি ধা
পা মা গা রে সা নি –
অ্যাদ্দিনে দুইজনে ঘর ছেড়ে হয়েছি বার –
তাইতো মোরা ভাবনা ভুলে, হালকা মনে,
গান করি আবার!
মোরা চলি, মোরা দেখি –
মোরা শুনি, মোরা শিখি –
অনেক চলে, অনেক দেখে –
অনেক শুনে, অনেক শিখে –
কেটে গেছে মনের অন্ধকার –
মোরা এখন জবর সমঝদার!
সা গা রে সা নি ধা
পা মা গা রে সা নি –
অ্যাদ্দিনে দুইজনে ঘর ছেড়ে হয়েছি বার –
তাইতো মোরা ভাবনা ভুলে, হালকা মনে,
গান করি আবার!

৩

সুধীজনে যত আছ
সবারেই করজোড়ে নমস্কার
করি নমস্কার!
এই তো মোদের গানের শুরু
মোদের বুকটা করে দুরু দুরু
কাজ যদি না হয়,
গানে কাজ যদি না হয়
তাইতো মোদের ভয়!
তবে দেখে শুনে বুঝি যতদূর
কাজ করেছে মোদের গানের সুর
কই, কেউ তো নড়ে না
কারুর চোখের পাতা পড়ে না
ফুর্তি! ফুর্তি!
চারিপাশে দেখি পাথর মূর্তি!
এইতো মোদের সেরা যাদু
এবার সভার যত অবাক লোকে
সবাই মিলে বল সাধু, সাধু!
বল সাধু, সাধু!

৪

মিছামিছি কর কেন চিন্তা –
বলি ভাবনার কিছু নাই!
মোরা দুজনাতে আছি
তোমাদের কাছাকাছি –
যদি কিছু ঘটে তবে
জেনে রেখো এটা সবে
কোনো বিপদে'র মোরা কভু না ডরাই!
মিছামিছি কর কেন চিন্তা –
বলি ভাবনার কিছু নাই!
মোরা ভূতের রাজার বরে ধন্য –
মোদের সাধ্য অনেক সেই জন্য –
তাই মোরা দুজনাতে,
এক জোটে এক সাথে,
অন্যায় দেখে ছুটে যাই –
তাই বলি নেই কোনো শংকা –
(মোরা) যমেরে দেখাই লবডংকা!
ঘরে গিয়ে বসে থাকো,
কোনো দ্বিধা কোরোনাকো,
জেনে রাখো মোরা কভু
করিনা বড়াই!
মিছামিছি কর কেন চিন্তা –
বলি ভাবনার কিছু নাই!

৫

কেমন বাঁশি বাজায় শোনো
মাঠেতে রাখাল –
তার সুরে বুঝি জাদু আছে
মন হল মাতাল।
গাছের ছায়ায় বসে মাঠে,
সুরের ঘোরে সময় কাটে –
সূর্যি নেমে গেল পাটে,
নাই কোনো খেয়াল।
কেমন বাঁশি বাজায় শোনো
মাঠেতে রাখাল।

৬

আ আ আ আ
আজ আজ আজ আজ
আজ থেকে, আজ থেকে,
আজ থেকে মোরা হয়েছি তৈয়ার
গুপী-বাঘা মোরা নেই জেনো আর
মোরা কি মানুষ নাকি জানোয়ার –
নাহি জানি উত্তর
মোরা যে ভয়ংকর!
মনিবের মোরা অন্ধ ভক্ত –
শিরায় মোদের ঠান্ডা রক্ত –
শয়তানি কাজে শক্ত পোক্ত –
হয়েছি ধুরন্ধর –
মোরা যে ভয়ংকর!
আদ্দিন মোরা ছিলাম আঁধারে –
দুষ্ট দমন করে বারে বারে –
ভুলটা এবার জানি হাড়ে হাড়ে –
ভালোরে করেছি পর –
(মোরা) ভালোরে করেছি পর –
মোরা যে ভয়ংকর!

৭

হুঁশিয়ার! হুঁশিয়ার! হুঁশিয়ার!
সব কাজ বন্ধ, হাঁটা চলা বন্ধ,
ওঠা বসা বন্ধ, কথা বলা বন্ধ,
চুপটি করে মুখটি বুজে,
থমকে থেমে থাক্!
এই ফাঁকেতে কাজটা সারা যাক্!
এইটা মোরা জানি –
এরেই বলে দিনে রাহাজানি!
এমন করার কিই বা কারণ,
সেইটা মোদের বলা বারণ,
মোরা শুধু গুরুর আদেশ মানি!
এইবারেতে কাজ –
তোমার কাছে আসা মহারাজ!
হীরা এলো মোদের হাতে –
মোরা এবার যাই তফাতে –
ফিরে আসা এই সভাতে
হবেনাকো আর!
হুঁশিয়ার! হুঁশিয়ার! হুঁশিয়ার!

৮

হুঁশিয়ার! হুঁশিয়ার! হুঁশিয়ার!
মোরা আসি ধেয়ে ধেয়ে,
দ্যাখ্‌রে তোরা চেয়ে চেয়ে,
কামনে মোরা গেয়ে গেয়ে,
করি মোদের কাজ –
তোর দ্যাখ্‌রে চেয়ে আজ!
মোটা ইনাম পেয়ে পেয়ে,
পেট ভরে রোজ খেয়ে খেয়ে,
দেশে দেশে যেয়ে যেয়ে,
করি মোদের কাজ –
তাতে নাইকো কোনো লাজ,
দ্যাখ্‌রে চেয়ে আজ!
ওইযে হীরা শোভে শিরস্ত্রাণে –
মোরা এলাম ওটার টানে –
ওইটা মোদের চাই!
দ্যাখ্‌রে তোরা কেমন করে
ওটারে হাতাই!
মোদের কাজ হয়েছে শেষ,
এবার মোরা ঘরে ফিরে যাই –
গুডবাই! গুডবাই! গুডবাই!

৯

ওইযে দেখ দিনের আলো ফোটে
পূবের আকাশ রাঙা করে
সোনার সূরয ওঠে–
এই আলোতে চাইছি মোরা মাপ,
মোদের কর ক্ষমা –
আর কভু না করব এমন পাপ!
লজ্জা! ছি, ছি লজ্জা!
আর তো কালো নাই –
মনের কালি মুছে গিয়ে
আবার মোরা ভালো –
মোরা ভালো, মোরা ভালো –
এত আলো!

১০

ওরে শয়তান!
তোর শয়তানির আজ হল অবসান!
এসেছে তোর যম!
তোর শাস্তি এবার হবেরে চরম!
নির্মম! শয়তান!
ওরে শয়তান!
এইবারে আর নাইরে পরিত্রাণ!

১১

আজকে মোদের আরাম বড়
শেষ হয়েছে মোদের কাজ!
ভূত ছাড়ানোর শেষে,
মোরা ফিরব আবার দেশে –
সিংহাসনে বসে আবার
হব মহারাজ!
তোমরা যে যেখানেই থাকো –
মোদের ভুলনাকো –
তোমরা রবে মোদের মনে
সকাল থেকে সাঁঝ –
সকাল থেকে সাঁঝ!

BDeBooks.com

E-BOOK

www.BDeBooks.com
FB.com/BDeBooksCom
BDeBooks.Com@gmail.com